অনীক

নভেম্বর ২০১২
বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ৫

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

দুই দেশ, দুই নির্বাচন... ❑ দীপ্র চৌধুরী ❑ ২
ডাক্তারি স্নাতকোত্তরে ভর্তি... ❑ শোভন গুহ ❑ ৪

প্রবন্ধ

জ্বালানি, জল ও ভাত-রুটির গল্প ❑ দীপঙ্কর দে ❑ ৫
ভারতে আসন্ন দুর্ভিক্ষ ❑ বিনায়ক সেন ❑ ১৯
অসম: স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন ❑ সঞ্জয় হাজারিকা ❑ ২২
নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলন ❑ সৌম্য দত্ত ❑ ২৮

স্মরণ

এরিক হব্‌সবম ❑ সিদ্ধার্থ গুহ রায় ❑ ৩২
হান সুইন স্মরণে ❑ ৩৩
কুং চিংলান কোটনিস ❑ মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত ❑ ৩৪

বিতর্ক : কানোরিয়া

প্রফুল্ল চক্রবর্তী / কুশল দেবনাথ ❑ ৩৬

কবিতা

আমার দিকে তাকাবে না? ❑ নাহিদা ❑ ৪০

**যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :**
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

সম্পাদকীয়

শাসক যখন শাসন করতে জানে না. . .

সংসদীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক বিধি অনুসারে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন পায় তারাই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ক্ষমতাসীন হয়। নির্দিষ্ট সময়কাল ফুরোবার আগেই তাদের 'ফিরিয়ে আনার' (রাইট টু রিকল) সাংবিধানিক বিধি না থাকলে, একবার ভোটে জিতে গেলেই তারপর তাদের অনুসৃত নীতি ভুল হোক বা ঠিক, তারা গণতন্ত্রের অনুশীলন করুক বা স্বৈরতন্ত্রের, পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তারাই ক্ষমতায় থেকে যায়। আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ সংবিধান-প্রণেতারা সাংবিধানিক বিধি প্রণয়ন করতে গিয়ে সম্ভাব্য প্রাসঙ্গিক একটি সমস্যার কথা সম্ভবত মনে রাখেন নি। সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, নির্বাচিত শাসকদের যদি শাসন করার ন্যূনতম যোগ্যতাই না থাকে, তাহলে কী হবে?

সংবিধান-প্রণেতাদের এই 'সামান্য' ভুলের ফল আজ ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের— পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের। তাই বলে ভারতের বা দেশের অন্যান্য রাজ্যের শাসকেরা সবাই যোগ্য এমন সার্টিফিকেট দেবার প্রশ্ন ওঠে না, তবে এই রাজ্যের বর্তমান শাসকবৃন্দ (এটা কথার কথা, আসলে একম ও অদ্বিতীয়ম শাসক!) তাঁদের উনিশ মাসের শাসনে অন্তত এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁদের একটি রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করার যোগ্যতাই নেই।

কেন এমন কথা বলছি? মূল কারণ, এই রাজ্যে একের পর এক সমস্যা তৈরি হচ্ছে, দুর্ভাবনায় ফেলার মতো নিদারুণ সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, শাসক কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, বলছেন : কিচ্ছু ঘটছে না, সবই নাকি 'সাজানো' ব্যাপার! তবে ঠিক কী কী তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তার একটা তালিকা করাই যায়—যেমন, ভোটের আগে তিনি কোনো 'মাওবাদী' অন্তত পশ্চিমবঙ্গে খুঁজে না পেলেও, ভোটের পরেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন; যেমন, ক্ষমতাসীন হবার ১০০ দিনের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন, এই রাজ্যের সব সমস্যার ৯০ শতাংশ সমাধান হয়ে গেছে। মুস্কিল হচ্ছে অন্য কেউ সেসব দেখতে পাচ্ছে না।

তবে কী কী তিনি দেখতে পাচ্ছেন না— অন্য সবাই পাচ্ছে, তার তালিকাটা তৈরি করা কঠিন ব্যাপার। সে তালিকায় প্রথমেই আসবে এ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী-নির্যাতন বা ধর্ষণের ঘটনাগুলি, ইতিমধ্যেই যে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে দ্বিতীয় থেকে প্রথম স্থানে আসার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। আসবে দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে একচ্ছত্র পার্টিতন্ত্র কায়েম করার জন্য গণতান্ত্রিক সব রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে দলীয় কর্মীদের সোজাসুজি মুগুর হাতে নেমে পড়ার ঘটনা—স্কুল-কলেজ-অফিস ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে, যা শাসকের চোখে 'বাচ্চা ছেলেদের ব্যাপার'। মানুষ কোন্ সংবাদপত্র পড়বে সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ ও লিটল ম্যাগাজিনগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করার প্রচেষ্টা, পুলিশ ও প্রশাসনকে দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার, কার্টুন প্রচার করার জন্য গ্রেপ্তার, কিংবা নোনাডাঙ্গায় 'উন্নয়ন'-এর অজুহাতে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে গরীব মানুষদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত ইত্যাদি যে স্বৈরতান্ত্রিক গতিমুখকেই স্পষ্ট করে দেয় সেটাও শাসক উপলব্ধি করতে পারছেন না— দেখতে পাচ্ছেন না যে, পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচিতদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আমলাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া, কিংবা মানবাধিকার কমিশনের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার পদক্ষেপগুলি এ দেশের প্রচলিত আইনেরই অস্বীকৃতি। দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে সংঘটিত অজস্র মার-দাঙ্গা-খুনোখুনির এবং ফলত তা থামাবার জন্য বগুলায়, দুবরাজপুরে বা তেহট্টে পুলিশের গুলিতে বারংবার মানুষ খুন হবার তাৎপর্যও অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে।

এই দেখা না-দেখার খেলাতে অবশ্য একটা সুবিধে হয়ে যাচ্ছে, সে সব সমস্যার বা সমাধানের বা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার কোনো দায়ও থাকছে না। কিন্তু উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলেই তো ঝড় আটকানো যায় না, সমস্যার সমাধানও হয় না। তাহলে?

রাজ্যের অবিসম্বাদী একচ্ছত্র শাসকের ভাষাতেই আবার বলতে হচ্ছে : এখনই এই অবস্থা, তাহলে 'এর পরে' কী হবে!

ঘটনাপ্রবাহ

দুই দেশ, দুই নির্বাচন ও দুই সম্ভাবনা

দীপ্র চৌধুরী

সম্প্রতি দু'টি দেশের দু'টি নির্বাচন নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল। দেশ দু'টির নাম সবাই জানেন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলা। দু'দেশেই ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টরা পুনর্নির্বাচিত হচ্ছেন কিনা, সেটা নিয়েই ছিল সবার ঔৎসুক্য। এবং ঘটনা হচ্ছে এটাই যে দু'দেশেই তাঁরা আবার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তাৎপর্য? দু'টোর তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম দেশটিতে, অর্থাৎ আমেরিকায় এই পুনর্নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে দুনিয়া জুড়ে, এবং দেশের ভিতরেও, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বা বিস্তারের এবং গণতন্ত্রকে কবর দেবার যে প্রক্রিয়া ওবামা চালাচ্ছেন নিওলিবারাল অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে, তারই ধারাবাহিকতা—ব্যাপক সাধারণ মানুষের আরও বেশি সর্বনাশ সাধনের সুনিশ্চিতি। আর ভেনেজুয়েলাতে তার অর্থ হচ্ছে সেই নিওলিব্যারাল অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের পথে, ব্যাপক মানুষের স্বার্থের সুরক্ষার দিকে আর একটি পদক্ষেপ।

কেন একথা বলছি। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। ওবামা চার বছর আগে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন পূর্ববর্তী (২নং) বুশ-এর জমানার চরম দক্ষিণপন্থার— দুনিয়া জুড়ে দেশে দেশে ছড়ি ঘোরানোর ও হানাদারি চালাবার এবং দেশের ভিতরে গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্রমাগত সংকোচনের প্রক্রিয়ার— অবসান ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বাস্তবে পদে পদে সেই প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করেছেন— প্রায় বুশ মডেলেই মার্কিন মদতে আগ্রাসন চলেছে লিবিয়ায়, বুশেরই অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করে নতুন আগ্রাসনের মহড়া চলছে সিরিয়া, ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়; আর দেশের ভিতরে 'বিল অফ রাইটস্'-এর মতো সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোনটিকে ব্যাপকভাবে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে।

এটা ঘটনা যে, ওবামা ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন পুঁজিবাদী দুনিয়ায়, বিশেষত মার্কিন দেশের চরম অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিকায়। কীভাবে ওবামা সেই সংকটের—যার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে—মোকাবিলা করেছেন? মার্কিন ইতিহাসের চরমতম ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটটি ঘটেছিল ১৯২৯-এ, এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইন্সের পরামর্শমতো তার মোকাবিলার চেষ্টা করেছিলেন 'নিউ ডিল' কর্মসূচির মাধ্যমে— যে কর্মসূচি অনুসারে সেদেশের অর্থনীতির প্রাইভেট সেক্টরে বেনজিরভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল তাঁর সরকার, সরকারি ব্যয়েশুরু হয়েছিল বিরাট কর্মোদ্যোগ, যার পরিণতিতে সেদেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষ একটু স্বস্তি পেয়েছিল। আর ২০০৮-এর এই দ্বিতীয় ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্য ওবামা নিয়েছেন তার ঠিক বিপরীত পথ— নিওলিবারাল্যাল অর্থনীতির পন্থা অনুসরণ করে দেশের নিচুতলার মানুষের প্রকৃত আয় কমিয়ে এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থায় কাঁটছাঁট করে 'উদ্বৃত্ত' বাড়ানোর এবং সেভাবে 'অর্জিত' লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার পুঁজিপতিদের স্বার্থে ব্যয় করার পথ। তাঁর প্রথম কিস্তির শাসনকালে পুঁজিপতি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের প্রকৃত আয় ক্রমাগত বেড়েছে আর খেটে-খাওয়া ব্যাপক মানুষের আয় কমেছে। ওবামার দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হবার ঘোষণা যেদিন করা হলো, তার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিতসেদেশের সেন্সাস ব্যুরোর সর্বশেষ রিপোর্টে জানা গেছে, এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৫ কোটি লোক— প্রতি ছ'জনে একজন— দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত। এমনকি কর্মরতদের ক্ষেত্রেও, পুরোসময় কর্মরতদের ৫.১ শতাংশ এবং আংশিক কর্মরতদের ১৮.৫ শতাংশ, সব মিলিয়ে মোট কর্মরতদের ৯.৪ শতাংশই বাস করছে দারিদ্র্যের মধ্যে। বস্তুত এটাই হচ্ছে ওবামা প্রশাসনের প্রথম কিস্তির চার বছরের 'সাফল্য'-এর সারবস্তু। আর আগেই বলেছি, সেদেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও ক্ষুধার প্রক্রিয়ার পিছনে কাজ করেছে ধনীদের আরও ধনী ও গরীবদের আরও গরীব করে দেবার ওবামা-নীতি।

এটাই শেষ নয়। বহু-চর্চিত মার্কিন গণতন্ত্র পায়ে পায়ে ক্রমশ স্বৈরতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অবকাশ প্রায় নেই বললেই হয়। সামাজিক অধঃপতন ব্যাপকভাবে ও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানবাধিকার শব্দটি ক্রমশ পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠছে। আগে যা স্বপ্নেও কল্পনা করা যেতো না, এখন সেটাই বাস্তবে ঘটছে— যে কোনো মার্কিন নাগরিককে তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আটক রাখা যাচ্ছে; প্রেসিডেন্টের নির্দেশে যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশ বা সিআই-এর লোকেরা খুন করতে পারছে, সেজন্য কোনো শাস্তির দাবি এমনকি আদালত পর্যন্ত নাকচ করে দিচ্ছে। অর্থাৎ কে মুক্ত থাকবে এবং কে জেলের ভিতরে, কে বেঁচে থাকবে ও কাকে খুন হতে হবে— সবটাই নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট ওবামা ও তাঁর প্রশাসনের ওপরে। তিনি শুধু প্রশাসকই নন, কার্যত জীবন-মরণ বা মুক্তি-বন্দীত্ব— সব কিছু ঠিক করার অধিকারী এক অঘোষিত স্বৈরতন্ত্রী। বহু-বিজ্ঞাপিত 'আমেরিকান স্বপ্ন' আজ দুঃস্বপ্নেরই আরেক নাম। এবং এর পরেও তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা

সারা দুনিয়ার দেশে দেশে সমৃদ্ধির পথ বাৎলাচ্ছেন, গণতন্ত্র ফেরি করে চলেছেন!

আর অন্য দিকে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি এর ঠিক বিপরীত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ কোনোদিন দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে পরিচালিত হয়নি, আর ভেনেজুয়েলাতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলছে যাতে জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অংশটাই তাদের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে। সেদেশ কোন্ পথে এগোবে সেটা দেশের পুঁজিপতিরা বা বিত্তশালীরা নয়, নাগরিকেরাই জাতীয় রেফারেন্ডামের মাধ্যমে ঠিক করে থাকে। সংবিধান ও নির্বাচনপদ্ধতিও অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, এমনকি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারও তাকে 'পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও উন্নত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। শাসনব্যবস্থাটিও দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক 'অংশগ্রহণ-ভিত্তিক' (Participatory) গণতান্ত্রিক। এটাই সর্বোত্তম, সেকথা বলার সময় এখনও না এলেও, এর গতিমুখ যে সেদিকেই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। সরকারি দপ্তরগুলি সংবিধান অনুসারে ঠিকঠাক চলছে কিনা, সাধারণ মানুষের তা দেখার সাংবিধানিক অধিকার আছে।

অথচ সদ্য-পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট চ্যাভেজ যখন এক দশক আগে প্রথম ক্ষমতায় এলেন, তখন পরিস্থিতি ছিল একেবারে অন্যরকম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের করাল নাগপাশে আবদ্ধ ও আইএমএফ-এর প্রদর্শিত পথের যাত্রী সে সেদেশটি তখন অর্থনৈতিকভাবে ধুঁকছে, দেশের অফুরন্ত তেলসম্পদ-সহ সমস্ত অর্থনীতিটাই ব্যবহৃত হচ্ছে বহুজাতিকদের মুনাফার ঝুলি স্ফীত করার লক্ষ্যে। সারা দেশ জুড়ে দারিদ্র্য আর ক্ষুধার রাজত্ব, চারদিকে নৈরাজ্য ও সামাজিক অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট পদসঞ্চার। এবং সেই প্রক্রিয়ায় যাতে কেউ কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা না করতে পারে সেজন্য সতর্ক প্রহরায় রয়েছে সর্বশক্তিমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সেই অবস্থাতেও যখন চ্যাভেজ প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন মার্কিনি ঈগলের কারসাজিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কিন্তু সেদেশের ব্যাপক মানুষ সেই শয়তানি চক্রান্ত মেনে নেয় নি, অভূতপূর্ব এক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল কোনো দলীয় নেতৃত্ব ছাড়াই, চ্যাভেজ আবার ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারপর প্রতিটি নির্বাচনেই ব্যাপক মানুষের সমর্থনে তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিনি শাসকরা সেটা চায় নি, তাই প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলেছে নির্বাচনের বা ১৯৭১-এর চিলির অ্যালেন্দের মতো সিআইএ-র চক্রান্তের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এবার তো তারা সর্বাত্মকভাবে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্রিলেস রাদস্কিকে ছলে-বলে-কৌশলে জেতাবার জন্য। ভেনেজুয়েলার পুঁজিপতি ও বহুজাতিকদের অধিকাংশ বড়ো সংবাদপত্র ও মিডিয়া তাতে সহায়তা করেছে, তবু এবারে প্রদত্ত ৮১ শতাংশ ভোটের মধ্যে ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে আবার নির্বাচিত হয়েছেন চ্যাভেজ। ক্যাপ্রিলেস পেয়েছেন ৪৫ শতাংশ।

কেন সেদেশের মানুষ বার বার তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই মিলে যাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু তথ্যের দিকে তাকালেই। ১৯৯৯-তে চ্যাভেজ প্রথম ক্ষমতাসীন হবার পরবর্তীকালে বেকারত্বের হার ১৪.৫ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭ শতাংশ; সারা দেশ জুড়ে গণচিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করার ফলে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ২০ থেকে ১৩-তে নেমে এসেছে; মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ হাজার; আর চরম দারিদ্র্যের হার ২৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ। উন্নতি হয়েছে অবৈতনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা, চাকুরি, আদিবাসীদের অধিকার, কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ, এবং সর্বোপরি মানুষের আত্মমর্যাদা রক্ষাকে আইনি স্বীকৃতি ও তা রক্ষা করে চলার ব্যাপারে। সমস্তরকম সেন্সরশিপ বন্ধ করা হয়েছে। মার্কিন দেশের সমগ্র ব্যবস্থাটিই যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মৌলিক বৈষম্যের উপরে, সেখানে এদেশের লক্ষ্য সম্ভবমতো তা কমিয়ে আনা। ফলত মার্কিন শাসকরা যখন দেশে ও বিদেশে গণতন্ত্রের ভিৎটাকেই ক্রমশ উপড়ে ফেলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে ভেনেজুয়েলা চেষ্টা করছে মডেল একটি সামাজিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও তার ভিত্তিটিকে দৃঢ়তর করে তুলতে। রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত তথ্য থেকেই প্রমাণিত যে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় ভেনেজুয়েলাই হচ্ছে সবচেয়ে কম বৈষম্যের দেশ। চ্যাভেজের পুনর্নির্বাচন সেই প্রক্রিয়াকেই আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শুধু দেশের ভিতরেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ভেনেজুয়েলার ভূমিকা ও ভাবমূর্তি। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রীটে'র অনেক আগেই সে ফাটল ধরিয়েছে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। বলিভারিয়ান বিপ্লব এই ব্যবস্থার দিকে সরাসরি এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— শুধু ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাবার জন্যই নয়, সারা দুনিয়ায় সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তোলার লক্ষ্যেও। ফলত সাম্রাজ্যবাদীদের বহু আয়াসে গড়ে-তোলা 'ওয়াশিংটন কনসেন্সাস' আজ কার্যত বাতিল হয়ে গেছে। গত দু'দশকে তার নাগপাশ বন্ধন ছেঁড়ার কাজে সবচেয়ে সফল হয়েছে ভেনেজুয়েলাই।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই চ্যাভেজ ভেনেজুয়েলার তেলের বিশাল ভাণ্ডারকে শুধু দেশের মানুষের স্বার্থেই নয়, ব্যবহার করছেন তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তেলের জোগান বাড়িয়ে দিয়ে মার্কিনগোষ্ঠির উপর তাদের নির্ভরতা কমাবার কাজেও।

২০০৬-এর হাইড্রোকার্বন অ্যাক্ট চালু করে এবং ওরিনোকো ব-দ্বীপে তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সরকার তেল থেকে অনেক বেশি অর্থ-উপার্জনেরও ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ১৯৯৯-তে তিনি যখন প্রথম ক্ষমতাসীন হন, তখনই ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও লিবিয়ার গদ্দাফির সাথে যৌথভাবে তিনি ওপিইসি যাতে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে তেলবাবদ বেশি দাম পায় তার এবং পশ্চিমা কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বেশি রয়ালটি আদায়ের ব্যবস্থা করেন। মার্কিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আগ্রাসনে বাকি দু'জন ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হয়েছেন। কিন্তু চ্যাভেজ এখনও সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বরং লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্টে দেবার ব্যাপারে তিনি আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। এই অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার ওএএস (অর্গানাইজেশন অফ অ্যামেরিকান স্টেটস্)-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তাঁদের গড়ে তোলা সিইএলএসি (কমিউনিটি অফ লাতিন অ্যামেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস্)। একই রকম আরেকটি সংস্থা অ্যালবা (বলিভারিয়ান অল্টারনেটিভ ফর অ্যামেরিকাস)-রও তিনিই মূল উদ্যোক্তা। তাঁদের এসব প্রচেষ্টা অধুনা নিষ্ক্রিয় জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলিরও সংহতি বাড়াতে সাহায্য করবে। এসব কারণেই কিউবা থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের প্রধানরা চ্যাভেজের বিজয়কে 'তাঁদেরও জয়' বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অবশ্য এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার কোনো কারণ নেই যে, ভেনেজুয়েলা একটি সমাজতান্ত্রিক স্বর্গের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ কথা বলাই যায় যে, কোনো শাসক সত্যি সত্যিই মেহনতি ও গরীব মানুষের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক পথে দেশ চালাবার চেষ্টা করলে কিছুটা অগ্রগতি ঘটবেই, এবং একই সঙ্গে জোরদার হয়ে উঠবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। তারপর প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথে এগোনো যাবে কিনা অনেক কিছুর উপরে সেটা অপেক্ষা করবে। কিন্তু সেই শাসকের, অর্থাৎ চ্যাভেজের বিজয় যে দুনিয়ার মানুষের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডাক্তারি স্নাতকোত্তরে ভর্তি নিয়ে গোলমাল

শোভন গুহ

গত ১৭ অক্টোবর, ২০১২ হাইকোর্টের এস কে মুখার্জি ও হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের স্নাতকোত্তর ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির সময়ের কাউন্সেলিং-এ রিমোট/ডিফিকাল্ট এরিয়া, অর্থাৎ দুর্গম/সমস্যাসংকুল এলাকায় কর্মরত চিকিৎসকদের আলাদা সুবিধা বা 'ইনসেনটিভ' দেওয়ার ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে। এই রায় বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুততার সঙ্গে পূজোর আগেই স্নাতকোত্তর কোর্স ইনসেনটিভ ছাড়া কাউন্সেলিং ও ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। এর ফলে গত কয়েক মাস ধরে ভর্তি নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আপাতত তার অবসান হলো ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যার কোনো সমাধান হলো না।

রিমোট/ডিফিকাল্ট এরিয়ায় নানারকম ঝুঁকি নিয়ে যে চিকিৎসকেরা কাজ করেন, স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার দাবি দীর্ঘ দিনের। মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (এমসিআই) নিয়ম অনুযায়ী স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি জন্য রাজ্যের রিমোট/ডিফিকাল্ট এরিয়ায় কর্মরত চিকিৎসকদের রাজ্য সরকার প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ ইনসেনটিভ দিতে পারে [Clause 9(1)(b), Post Graduate Medical Education Regulation 2000, Medical Council of India]। ২০১২-১৩ সাল থেকে এই নিয়ম চালু করতে চেয়ে গত নভেম্বর, ২০১১-য় রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এ রাজ্যের রিমোট/ডিফিকাল্ট এরিয়ার জেলাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করে [HF/O/MERT/1882/W-62/2008, dt. Kolkata, 23rd November, 2011]। এতে পশ্চিমবঙ্গের ১৯ জেলার মধ্যে ১২টি জেলা ও দার্জিলিংয়ের ৩টি মহকুমাকে রিমোট/ডিফিকাল্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চাদপদ জেলার শ্রেণীবিভাগ (রাজ্য সরকারের কিছু পরিবর্তন সহ)। কিন্তু একই জেলার বিভিন্ন এলাকার মধ্যেকার আর্থিক-সামাজিক-ভৌগোলিক পার্থক্যগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্ধের মতো ঐ শ্রেণীবিভাগকে অনুসরণ করার ফলে হাস্যকর পরিস্থিতির তৈরি হলো।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাকে পশ্চাৎপদ দেখানোর ফলে টালিগঞ্জের এম আর বাঙ্গুর হসপিটাল আর বাঘাযতীন স্টেট হসপিটাল রিমোট/ডিফিকাল্ট এরিয়ার মধ্যে চলে যায়। অন্যদিকে উত্তর চব্বিশ পরগণাকে পশ্চাৎপদ না দেখানোর ফলে সুন্দরবনের সন্দেশখালির ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঐ তালিকা থেকে বাদ চলে যায়। এই তালিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঐ মাসেই প্রার্থী চিকিৎসকদের একটি দল হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে। জানুয়ারি ২০১২- তে হাইকোর্টের অন্য একটি ট্রায়াল বেঞ্চ রাজ্য সরকারের তালিকাকেই মান্যতা দেয়। এর বিরুদ্ধে আবার আবেদন করা হলে মে ২০১২- তে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের তালিকাকে 'অসাংবিধানিক', 'হঠকারী' ও 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়ে তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

এর পর ১৮ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

জ্বালানি, জল ও ভাত-রুটির গল্প

দীপঙ্কর দে

এক

সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০১২) ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ডিজেল এবং পারিবারিক ব্যবহারযোগ্য এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। সাথে খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরকারের অন্যতম শরিক সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে পদত্যাগ করেছে। বাম ও কতিপয় দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল ২০ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী হরতাল পালন করেছে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট ভেঙ্গে গেছে। রাজ্যের কংগ্রেসি মন্ত্রীরা ইস্তফা দিয়েছেন।

বিরোধিতার জবাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক ভারতের বিভিন্ন দৈনিকে (১৭ সেপ্টেম্বর) নানা পরিসংখ্যান সহযোগে পেট্রো-পণ্যে ভর্তুকি হ্রাসের স্বপক্ষে সওয়াল করেন। ১৮শে সেপ্টেম্বর (২০১২) জাতির উদ্দেশে বেতার ও দূরদর্শনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ জানিয়ে দেন, সংস্কারের এই দ্বিতীয় পর্যায় দেশের স্বার্থেই অপরিহার্য। সংস্কার কর্মসূচি, যা তিনি ১৯৯১ সালে সূচনা করেছিলেন এক বিশেষ অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায়, তা অব্যাহত থাকবে। পরদিন কলকাতার এক 'বহুল প্রচারিত' সংবাদপত্র, যা প্রতিদিন 'উনষাট লক্ষ পাঠকের কাছে সুচিন্তিত মতামত পৌঁছে দেয়', প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণকে 'সিংহ বিক্রম' বলে সাধুবাদ জানায়।[১]

এবার দেখা যাক, পেট্রোপণ্যের ভর্তুকি হ্রাস ও খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কী কী যুক্তি দিয়েছেন (বন্ধনিতে আমাদের টীকা ও টিপ্পনি)।

সরকারি যুক্তি:

(১) আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। যেহেতু দেশের চাহিদার ৭৪ শতাংশ আমদানি-নির্ভর তাই ভারতের পেট্রোপণ্যের (ডিজেল সহ) মূল্য বহুলাংশে বিশ্ববাজার দরে নির্ধারিত। সরকারি বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছে— ১৯৯৮-২০১২, এই চোদ্দ বছরে দেশে ডিজেলের দাম বাড়াতে হয়েছে ৩৪ বার।

(আন্তর্জাতিক বাজারে Brent ক্রুড-এর দর জানুয়ারি ১৯৯৮-এ ছিল ব্যারেল প্রতি ১৫.০৯ মার্কিন ডলার, আর আগস্ট ২০১২-এ বাজার দর ব্যারেল প্রতি ১১৩.৩৪ মার্কিন ডলার। এই সময়ে ব্যারেল প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর ছিল যথাক্রমে ৯.৪ (ডিসেম্বর ১৯৯৮) ও ১২৪.৯৩ (মার্চ ২০১২) মার্কিন ডলার। আর্থিক মন্দায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম এখন নিম্নমুখী। সরকার ৩৪ বার ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেছেন কিন্তু বিশ্ববাজারে দাম কমলে মূল্যহ্রাস হয়েছিল কি?)

(২) অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে যুক্ত হয়েছে মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাস। গত এক বছরে টাকার মূল্য প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

(প্রশ্ন করাই যেতে পারে, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের রথে চেপে রপ্তানি ও জাতীয় উৎপাদন যদি সত্যিই উচ্চ হারে (৮ শতাংশ হারে) বেড়ে থাকে গত দু দশকে, তবে ভারতীয় মুদ্রার কেন এত দ্রুত মূল্যহ্রাস হচ্ছে? দেশে তো তেমন দাঙ্গা, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটেনি। মুদ্রার মূল্যহ্রাস কীসের ইঙ্গিত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? আপনার প্রবর্তিত 'এলপিজি' (লিবারালাইজেশন-প্রাইভেটাইজেশন-গ্লোবালাইজেশন) কি পোড়াচ্ছে সবকিছু— যা ছিল নিজস্ব, লৌকিক ও স্বদেশি? মুদ্রার অবমূল্যায়নে কার লাভ, ড. সিংহ? বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এক বছর আগে এক ডলারে ৪৫ টাকা মূল্যের ভারতীয় সংস্থার শেয়ার কিনতে পারতেন, এখন এক ডলারে ৫৫ টাকার শেয়ার কেনেন। 'বিশ্বায়ন দীর্ঘজীবী হোক'!)

(৩) ডিজেল, কেরোসিন ও গৃহে ব্যবহৃত এলপিজি সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করার ফলে রাষ্ট্রীয় পেট্রোপণ্য বিপণন সংস্থাগুলোর উক্ত তিন জ্বালানি বাবদ বাৎসরিক (২০১১-১২) ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১,৩৮,৫৪১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশাল ঘাটতি না মেটালে রাষ্ট্রীয় তেল বিপণন সংস্থাগুলো এতদিনে দেউলিয়া হয়ে যেত। ডিজেলের মূল্য লিটার পিছু ৫ টাকা বাড়ানো সত্ত্বেও সরকার প্রতি লিটারে ১৩.৬০ টাকা ভর্তুকির ব্যবস্থা করে থাকে, যার ফলে ২০১২-১৩ বর্ষে স্রেফ ডিজেলে প্রায় ১,০৩,০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। সরকার বছরের পর বছর

১। খবরে প্রকাশ, ২০১০-১০১২ এই দুই বছরে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো খুচরো ব্যবসায়ী ওয়ালমার্ট ভারতে 'লবি' করার জন্যে ১ কোটি ডলার খরচ করেছে। এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষে যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে, তাকেই সম্ভবত বলে 'সহমত নির্মাণ' বা 'engineering of consent'! নাৎসি আমলে গোয়েবেলস এ তত্ত্বের (প্রবক্তা ফ্রয়েডের ভাইপো এডওয়ার্ড বার্নেস) সফল প্রয়োগ করেছিলেন রাজনীতিতে। আধুনিকীকরণের দোহাই দিয়ে এদেশে রেল বাজেটের আগে যাত্রীভাড়া বাড়ানোর স্বপক্ষে এভাবেই জনমত গঠনের চেষ্টা হয় প্রতিবছর।

ভর্তুকির বোঝা বইতে পারবে না।

(২০১১-১২ সালে তেল শিল্প থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আয় করেছে ১,৯৬,৬০০ কোটি টাকা। সরকারি তেল সংস্থার মুনাফা (৬,১৭৭ কোটি টাকা) যোগ করলে সরকারের মোট আয় দাঁড়ায় ২,০২,৭৭৭ কোটি— যা দেয় ভর্তুকির (১,৩৮,৫০০) চেয়ে ৬৪,২৭৭ কোটি টাকা বেশি। সরকার তো মাছের তেলে মাছ ভাজে! তবে মমতা সরকার যদি ডিজেল থেকে আদায়কৃত বাড়তি করটুকু ছাড় দিতেন তবে তাঁর বিরোধিতা আরও জোরালো হতো।)

(৪) শুধু জ্বালানিতেই নয়, খাদ্য ও রাসায়নিক সারেও বিশাল ভর্তুকি দেয় সরকার। ২০১০-১১ সালে উক্ত দুই ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০,৬০০ ও ৫৪,৯৭৭ কোটি টাকা। খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস করা যাবে না। তা সমীচীনও নয়।

(২০০৭-০৮ সালে খাদ্যে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৩১,৩২৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে পরিমাণ ১৯৪ শতাংশ বেড়েছে। উক্ত সময়ে রাসায়নিক সারে দেয় ভর্তুকির পরিমাণ বেড়েছে ১৬৯ শতাংশ। ইদানিং খাদ্যে ভর্তুকি প্রদানের পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করবো শেষ অধ্যায়ে।)

(৫) গৃহে ব্যবহৃত ভর্তুকি প্রাপ্ত এলপিজি সিলিন্ডার বছরে পরিবার পিছু ৬টা সরবরাহ করা হবে, কারণ সাধারণ পরিবারে ৬টার বেশি সিলিন্ডার দরকার হয় না। যাদের বেশি প্রয়োজন তারা বাজার দরে তা ক্রয় করবেন। তাদের সুবিধার্থে সরকার আমদানি শুল্কে ছাড় দেবে।

(এনএসএসও সার্ভের ৬১তম রাউন্ড (২০০৪-০৫) বলছে, গ্রামে সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ গ্রাহক বছরে ৫.১৭টি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন। সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবারে লাগে বছরে ৭.৯১টি। শহরে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৮.১৭ ও ১০.১৭টি। একই সময়ে মাত্র ৮.৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার এলপিজি ব্যবহার করতেন। সরকার হঠাৎ ৬টা সিলিন্ডারের হিসেব কী করে করলেন? শহরের সবচেয়ে গরীব ১০ শতাংশ গ্রাহকও তো ৮টার বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন। সরকার সম্ভবত অনুমান করেছেন যে বিগত ক'বছরে মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে গরীব ও মধ্যবিত্তের খাদ্যতালিকায় কাটছাট নিশ্চয়ই করতে হয়েছে। যা রান্না হবে তাতে ৬টা সিলিন্ডারই যথেষ্ট।)

(৬) জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, লিটার পিছু ৫ টাকা আমদানি শুল্ক কমিয়ে তিনি পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি রুখে দিয়েছেন, কারণ সাধারণ মানুষ পেট্রোল চালিত স্কুটার/মোটরবাইক চালান। দাম বাড়ালে তাদের সমস্যা হতো।

(স্কুটারকে শিখণ্ডী করে উচ্চবিত্তের মোটর গাড়ি কী সুন্দর পার পেয়ে গেল!)

(৭) খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ দরকার, কারণ কৃষিতে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের জন্যে বিনিয়োগ দরকার।

(সরকার বিনিয়োগ করলেন না কেন? পরিসংখ্যান বলছে, গত আশির দশক থেকে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে কমেছে। ১৯৭৯-৮০ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা খাতে মোট বিনিয়োগের ২৭ শতাংশ ব্যয় হতো 'কৃষিক্ষেত্রে, সেচ প্রকল্পে ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে'। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০২-২০০৭) এই অনুপাতটি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১০.৭ শতাংশে। এভাবে কি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল?)

পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে, ২০১০ সালের ২৫শে জুন ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পেট্রোপণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে বাজারের চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে। সরকারের সেই সিদ্ধান্তের ফলে সেদিন থেকেই পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পায় লিটার পিছু ৩.৫০ টাকা। কেরোসিন ও ডিজেলের দাম বাড়ে লিটার প্রতি যথাক্রমে ৩ টাকা ও ২ টাকা। সিলিন্ডার প্রতি রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ে ৩৫ টাকা। শক্তি বিশেষজ্ঞ কিরীট পারিখের নেতৃত্বাধীন এক উচ্চক্ষমতাশীল কমিটি (The Expert Group on a Viable and Sustainable system of Pricing of Petroleum Products) ২০১০ ফেব্রুয়ারি এক বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে সেসময় সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য নির্ধারণে যে 'সাহসী' পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা রাজনৈতিকভাবে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সাময়িক কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়া সেবার সরকারের ঐ সিদ্ধান্তের কোন বিরোধিতাই হয়নি। (বিস্তারিত জানতে দেখুন 'অনীক' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০)। এবারও সম্ভবত সরকার তেমন বিরোধিতার সম্মুখীন হবে না ডিজেল ও সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। বিরোধিতা হবে মূলত খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে। কী বুদ্ধি বাতলেছিল সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি যার জোরে সরকার বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে? বিভিন্ন পেট্রোপণ্যের গ্রাহকদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে তাঁরা অভয় দিয়ে বলেছিলেন, দাম বাড়ালে কোন সমস্যাই হবে না। মোকাবিলা করা যাবে সব বিরোধিতার।

পেট্রোল— তাঁরা হিসাব কষে বলেছিলেন, পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৭ টাকা বাড়লে, যারা স্কুটার প্রভৃতি দ্বিচক্রযান চালান, তাদের মাসিক ব্যয় বাড়বে আনুমানিক ৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা। লিটারে ২৩ টাকা বাড়লে, মাসিক ব্যয় বাড়বে ১৬০ টাকা, মোটর গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতিমাসে ব্যয় বাড়বে প্রায় ১০০০ টাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক চিত্রটা তুলে ধরলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নাগরিকরা এই বাড়তি ব্যয়ভার হাসিমুখে

মেনে নেবেন।

সেবার সত্যিই তারা মেনে নিয়েছিলেন, কারণ মিডিয়া 'সঠিক চিত্রটা' তুলে ধরেছিল। আর এবার তো সরকার পেট্রোলের দাম বাড়ালেনই না মধ্যবিত্ত স্কুটার চালকদের কথা ভেবে!

ডিজেল— ডিজেলের মূল্য বাড়ানো যেতে পারে কারণ—

(ক) দাম বাড়ার ফলে কৃষিতে উৎপাদন খরচ বাড়লেও সরকার কৃষিপণ্যের 'ন্যূনতম যোগান দাম' নির্দিষ্ট করার সময় বাড়তি খরচ পুষিয়ে দেবেন। কৃষককে কোন অতিরিক্ত আর্থিক চাপ নিতে হবে না। বরং দাম বাড়লে পরোক্ষে জলের অপব্যবহার হয়তো কিছুটা সীমিত হবে।

(অকাট্য যুক্তি। যে ক্ষুদ্রচাষি নিজের খোরাক যোগাতে চাষ করে, বিক্রি করার মত উদ্বৃত্ত ফলন হয় না যার, সে কী করবে? সরকার জানে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির গলা ও বাহুর জোর কম। তাদের নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। বড়ো চাষিকে বশে রাখলেই সব শান্ত হয়ে যাবে। তাই গত দশ বছরে ধান ও গমের সরকার বেঁধে দেওয়া 'ন্যূনতম' দর দ্বিগুণ হয়েছে।)

(খ) পণ্য পরিবহনে ডিজেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি (৩৭ শতাংশ)। দাম বাড়লে পরিবহন খরচ বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে আর্থিক উন্নয়নের সাথে তাল রেখে এই বাড়তি খরচ পরিবহন সংস্থা সহজেই বহন করতে পারবে। উপরন্তু, তাঁদের মতে, পণ্য পরিবহনে রেল পরিষেবা, যা মালবাহী ট্রাকের তুলনায় মাত্র ২৫ শতাংশ ডিজেলে পণ্য বহন করতে পারে (অর্থাৎ, একটন পণ্য ৫০ কিমি বহন করতে মালবাহী ট্রাকের যদি ৪ লিটার ডিজেল লাগে, ঐ পরিমাণ পণ্য একই দূরত্বে রেল ১ লিটারে ডিজেলে বহন করবে), জনপ্রিয় হবে। কিন্তু রেল জনপ্রিয় হলে মালবাহী ট্রাক ও বাস মালিকদের সর্বনাশ। ডিজেলের দর বৃদ্ধি সেক্ষেত্রে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। গত বাজেটেই তাই রেল ভাড়া আর মাশুল বৃদ্ধি সুপারিশ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে তখন তা সম্ভব হয়নি। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির এক সপ্তাহের মধ্যেই তাই পরিষেবা কর চাপিয়ে রেলভাড়া ও মাশুল দুই বাড়ানো হলো। ভবিষ্যতে আরও বাড়বে 'ডিজেল লবি'র চাপে।)

(গ) হিসাব কষে দেখা গেছে ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৪ টাকা বাড়ালে যতোটা মুদ্রাস্ফীতি হয় ভর্তুকি হেতু মুদ্রাস্ফীতির হার তার চেয়ে বেশি।

(এবার তো দাম অনেকটাই বেড়েছে তাই মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়বে নিশ্চয়ই। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম, বাসভাড়া, রেলভাড়া সবই বাড়বে। না, সরকারের ভয় নেই। জোরালো প্রতিবাদ হবে না। ডিজেলের দাম বাড়ার দু'দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার ডিএ বাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যসরকারি কর্মচারী ও সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদেরও মহার্ঘ্য ভাতা বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি (তা লাগামছাড়া না হলে) ব্যবসায়ী ও পণ্য উৎপাদনকারীদের খুব একটা ক্ষতি করবে না, কারণ 'মহার্ঘ্য ভাতা'র কল্যাণে মধ্য ও উচ্চবিত্ত ভোক্তাদের পণ্যচাহিদা কমবে না। মার খাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষ। তাদের বাজারের থলে আরও ছোট হবে। বাসে না চেপে ঝরঝরে সাইকেলে গোপাল প্রামাণিক গড়িয়ার ব্রহ্মপুর থেকে ভোর ৭টায় রওনা দেবে সল্টলেকে সেক্টর ৫-এর উদ্দেশে। না! গোপাল কোন সফট্ওয়ার কোম্পানিতে ৫০,০০০ হাজার টাকা মাইনের 'জ্ঞান-শ্রমিক' (Knowledge worker) নয়। এক সিকিউরিটি এজেন্সির ছ'হাজার টাকা মাইনের 'পরিষেবা শ্রমিক' সে। রোদ, বৃষ্টি, কুয়াশা মাথায় করে প্রতিদিন কুড়ি কুড়ি মোট চল্লিশ কিলোমিটার জনবহুল পথ জীবন হাতে নিয়ে পাড়ি দেয় সে। তার মাথায় কোন 'হেলমেট' নেই। পুলিশ বলেও না পরতে। কারণ সাইকেল আরোহীর হেলমেট বাধ্যতামূলক নয়। ড. কিরীট পারিখ ও ড. মনমোহন সিংহের মতো আমাদের কাছেও গোপালদের মাথার কোন দাম নেই। খোলা বাজারের নিয়মে যে পণ্যের কোন দাম নেই তার কোন কদরও নেই। বাজারের এই খেলায় গোপাল আর মালতীরা— আনুমানিক প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ— আজ ব্রাত্য।)

এলপিজি— বিশেষজ্ঞদের মতে, শহরের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ বিত্তবান পরিবার মোট সিলিন্ডারের ৪০ শতাংশ ব্যবহার করে। ভর্তুকির বিরাট অংশ এরাই ভোগ করে, যদিও জ্বালানি খাতে বাড়তি খরচ বহনের সামর্থ্য তাদের আছে।

(যুক্তি ভালোই। তবে বিত্তবানদের ভর্তুকি দিয়েছিলেন কেন? কোন বিশেষ কারণ ছিল? গাছে তুলে এবার মই কেড়ে নিচ্ছ, কারণ নামতে সে আর পারবে না বলে?)

দুই

এ প্রবন্ধে আমরা নিম্নোক্ত ৪টি প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো।

(১) খাদ্য, পেট্রোপণ্য ও কৃষিতে সরকার ভর্তুকি দিল কেন? (স্রেফ দারিদ্র্য দূরীকরণ?)

(২) খাদ্য সুরক্ষায় ও জনজীবনে ভর্তুকির পরিণাম কী?

(৩) ইদানিং পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি হ্রাসের কারণ কী?

(৪) খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কি সাধারণ মানুষের ভাত-রুটির যোগান বিপন্ন করবে?

১) কেন ভর্তুকি

সদ্য-স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থাটা একটু বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত ভর্তুকির রহস্যটা উদ্ঘাটন করা যাবে। যখন আশি শতাংশেরও বেশি নাগরিকের বাস আনুমানিক ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার গ্রামে।

১৯৪৭ সালে মাত্র ১৫০০টি গ্রামে (০.২৫ শতাংশ) বিদ্যুতের খুঁটি পৌঁছেছে (গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো ও গৃহস্থের ঘরে

বিদ্যুৎ পৌঁছানো— এ দুয়ের ফারাক অনেক ক্ষেত্রে কয়েক দশক)। ১৯৫১ সালে দেশের মাত্র ০.৫২ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়। এক দশক পর যা দাঁড়ায় ৩.৭০ শতাংশে। দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই-এর মতো কয়েকটি শহরের বাইরে গোটা ভারতবর্ষ ও তার ৮০ শতাংশেরও বেশি নাগরিক সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকতো। মুষ্টিমেয় ঘরে জ্বলতো কেরোসিন ল্যাম্প (হ্যারিকেন)। অন্য সব বাড়িতে রেড়ির তেলের সেজ বাতি ভরসা। (তুলসিতলায় বা ঠাকুরঘরে এখনও সর্ষের তেলের প্রদীপ দেওয়াই প্রথা)। কেরোসিন সরবরাহ করত বিদেশি তেল সংস্থা আর রেড়ি বা সর্ষের তেল (স্থান বিশেষে নারকেল তেল) মেয়েরাই তৈরি করতেন। কোথাও বা গ্রামেরই তেলকলে পেশাই হতো সর্ষে বা রেড়ির বীজ। এক বিশাল সংখ্যক নাগরিকের গৃহে আলো যোগাতে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকাই ছিল না।

খাদ্যের যোগান হতো কীভাবে? পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। অন্যান্য রাজ্যের চিত্র কমবেশি একইরকম। বর্ষা নামলে কৃষক লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেত। যত্নে তুলে রাখা বীজ বুনত, ফসল উদ্বৃত্ত হলে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে হাটে নিয়ে যেত। সে ফসল ঢেঁকিতে ছেঁটে চাল, চিঁড়ে, মুড়ি, কখনও বা ডাল, তিল, তিসি, ছাতু, বেসন তৈরি হতো ঘরে ঘরে। রান্না হতো মাটির উনুনে। খড়কুটো, ঘুঁটে, শুকনো ডালপালা জ্বেলে। অনেক কৃষক পরিবারেই গরু-বলদ ছিল। মূলত গোবর আর খোলই চাষে ব্যবহার হতো সার হিসেবে।

জন্মের দু'দশক পরেও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের দুই মৌলিক চাহিদা— খাদ্য ও জ্বালানির যোগানে কোন ভূমিকাই ছিল না রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রপিতার পক্ষে এমন পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক নয়। একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে। এদিকে মার্কিন সরকার ও সেদেশের বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলো বিশ্বে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার তাগিদে এক অভিনব ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, বিমানে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের চাহিদা কমে গেলে, খনিজ তেল শিল্পের তাগিদে শুরু হয় বিকল্প চাহিদা তৈরির চেষ্টা। যাটের দশকে আবিষ্কার হয় তেল (ন্যাপথা) নির্ভর রাসায়নিক সার তৈরির প্রযুক্তি, যা কৃষি ও খাদ্যশিল্পে একচেটিয়া অধিকার কায়েমের সম্ভাবনা সূচিত করে।[২] স্ট্যান্ডার্ড অয়েল প্রতিষ্ঠিত রকেফেলার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তারা তৃতীয় বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোতে (যেমন মেক্সিকো ও ভারতে) এক নতুন কৃষি পদ্ধতি শুরু করতে চাইল, যার মূলে ছিল তিনটি প্রধান উপাদান— রাসায়নিক সার, উচ্চ-ফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক কীটনাশক।

চাইলেই তো হলো না! হাজার বছরের বৃষ্টিনির্ভর চাষ পদ্ধতি বিদেশি কোম্পানির কথায় কৃষক রাতারাতি পাল্টে ফেলবে? তাছাড়া বৃষ্টির জলে সার ধুয়ে অন্যের জমিকে উর্বরা করে। সুখা মরশুমে চাষ করা যায়, কিন্তু জল যোগাবে কে? বহুজাতিক বীজ, সার, কীটনাশক ও তেল কোম্পানির পক্ষে এই বিশাল দেশের ৫,৮৭,০০০ টি গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তার চাই এক সহযোগী। সরকার ছাড়া আর কেই বা হাল ধরবে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের! (বেসরকারি দেশীয় পুঁজি তখন সবে হামা দিচ্ছে। বিদেশি পুঁজির সহযোগী হতে সে অক্ষম।)

সরকারও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে তুলে নিতে হবে। তাই বহুজাতিক পুঁজি ও রাষ্ট্র নিজেদের তাগিদে হাত মেলালো। যাটের দশকে 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনা হলো এদেশে। কৃষিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ আজ নতুন নয়। রূপ পাল্টেছে শুধু। আগে বিদেশি পুঁজি প্রভাব ঘটিয়েছে আড়ালে, চালকের আসনে ছিল রাষ্ট্র। এখন চালকের আসনটাই চাইছে তারা।

যা বলছিলাম, শুধা মরশুমে সবুজ বিপ্লব সার্থক করতে চাই জল— অনেক জল। আর চাই রাসায়নিক সার। উন্নত বীজ চায় রাসায়নিক সার, সার চায় জল। এদিকে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি এখনও প্রায় ৯৫ শতাংশ গ্রামে। তাই ভূগর্ভের জল তুলতে চাই ডিজেল। না, বাজার দরে কিনতে হবে না। সরকার সস্তায় দেবে। সারও যোগাবে সরকার। সদ্য নির্মিত রাষ্ট্রীয় শোধনাগারের পাশে গড়ে উঠল সার কারখানা। ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল পৌঁছে গেল সেখানে। উৎপন্ন হলো হাজার হাজার টন 'সুফলা'।

নূতন বীজ, ডিজেল পাম্পে তোলা জল ও রাসায়নিক সারের কল্যাণে উৎপাদন ভালোই হলো। কৃষকের এবার মাথায় হাত। যোগান বেশি, চাহিদা কম। এতদিন কৃষিকার্যে খরচ প্রায় ছিলই না। বীজ, গোবর সার, লাঙল এসব নিজের আয়ত্তেই ছিল তার। এখন বীজ, সার, ডিজেল (যার পাম্পসেট নেই সে ঘন্টা হিসেবে জল কেনে), 'বিষ' সবই বাজার থেকে কিনতে হয় (সরকার যতই ভর্তুকি দিক)। এ চাষে যে লোকসান! এগিয়ে এলো রাষ্ট্র। কৃষক কবে রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হবে, তারই তো অপেক্ষায় ছিল সে এতকাল। রাষ্ট্র এবার খাদ্যশস্যের ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দিল। যা বাজার নির্ধারিত মূল্যের বেশি। কে কিনবে বেশি দামে ধান গম? রাষ্ট্র কিনবে, এবং তা সস্তায় দেশবাসীকে বিতরণ করবে। ১৯৬৪ সালে গঠিত হলো ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI)। রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া বর্ধিত মূল্যে এফসিআই খাদ্যশস্য ক্রয় করে লক্ষ লক্ষ রেশন ডিলারের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল চাল, গম, আটা, ডাল, রান্নার

২। রাসায়নিক সারের মূল উপাদান নাইট্রোজেন (অ্যামোনিয়া) বোমা (টিএনটি) তৈরিতে অপরিহার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিনরা নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য ১০টি কারখানা স্থাপন করে। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ টন। যুদ্ধ শেষে কী হবে এত অ্যামোনিয়া? কৃষিতে ব্যবহার করো সার হিসেবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের জন্ম মারণাস্ত্রের আতুরঘরে— বিনাশের তাগিদে।

তেল ইত্যাদি। সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ভর্তুকিতে কেরোসিন তেলও বিপণন করে থাকে। ফুড কর্পোরেশন ও গণবণ্টন ব্যবস্থা, যা একে অন্যের পরিপূরক, সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল 'রিটেল' চেন। এভাবেই রাষ্ট্র ও বহুজাতিক পুঁজি, ভর্তুকির জটিল অংকে, খাদ্য-জল-জ্বালানির উপর তাদের বহুকাঙ্খিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ও গ্রামীণ বাজারের দখল কায়েম করার সুযোগ পেল সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে।

পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি শুধু ভারত সরকারই দেয় নি। অন্তত পাঁচ দশক আগে এদেশে এর পথ দেখিয়েছে তো এক বিদেশি তেল কোম্পানি। ১৯২০-৩০ দশকে ভারতে কেরোসিন ব্যবহৃত হতো মূলত বাতি জ্বালাতে। বার্মা অয়েল কোম্পানি ছিল একচেটিয়া কারবারি। ভারতের 'গরীব মানুষের কথা ভেবে' আন্তর্জাতিক বাজার দরের কম দামে তারা 'দেশি' কেরোসিন (যা মূলত বাতি জ্বালাতেই লাগে) বিক্রি করত। অনেক দিন পর বিপ্লব দাশগুপ্ত তাঁর পুস্তকে উক্ত তেল কোম্পানির জনকল্যাণমূলক দাবিকে নস্যাৎ করে দেখিয়েছেন কম দামে কেরোসিন বিক্রির মূল কারণ ছিল ব্যবসায়িক— (১) দামী কেরোসিন গরীব ভারতীয়ের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে— রেড়ির তেল হঠাতে দাম কম রাখতেই হতো; (২) শহরাঞ্চলে কেরোসিনের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাসের তেল (গ্যাস অয়েল)। তার দাম ছিল কেরোসিনের বাজার দরের অর্ধেক!

স্কটিশ তেল কোম্পানির ব্যবসায়িক বুদ্ধি রপ্ত করে ভারত সরকার জনগণের প্রাত্যহিক ন্যূনতম চাহিদার যোগানে কর্তৃত্ব কায়েম করতে সফল হয়েছে খুব অল্প সময়ে। মাত্র কয়েক বছরে হাজার বছরের কৃষিব্যবস্থা ও নাগরিকের জীবনযাত্রা আমূল বদলে ফেলা সহজ কথা নয়।

পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি ও সবুজ বিপ্লব ভারতের অর্থব্যবস্থায় ও জনজীবনে এক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।[৩] সরকারি ভর্তুকির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কায়েম করা— গরিবের উন্নয়ন নয়, ওটা কথার কথা। গরিবের কথা ভাবলে দেশে এত অনাহার অর্ধাহার থাকত না আজও। এভাবে এফসিআই-র গুদামে খাদ্যশস্য নষ্ট হতো না দিনের পর দিন।

২) খাদ্য সুরক্ষা ও জনজীবনে সরকারি ভর্তুকির পরিণাম

ক) খাদ্য সুরক্ষা

সবুজ বিপ্লব ও তার হাত ধরে আসা 'শ্বেত বিপ্লব' দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছে বেশ কয়েকগুণ। ১৯৬১ সালে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো ৬.০৯ কোটি টন। ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.২৪ কোটি টন, অর্থাৎ পাঁচ দশকে উৎপাদন বেড়েছে ৩.১৫ গুণ, যেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে ২.৬৪ গুণ। শস্য উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। নিঃসন্দেহে ভারতের মত জনবহুল দেশে এ এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। একে সরকারি খাদ্যনীতির সুফল বলে দাবি করা যেতেই পারে। ১৯৫০-৫১ থেকে ২০১০-১১, এই পাঁচ দশকে দুধ, ডিম ও মাছ উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ৭.১, ৩৪.৪ ও ১১ গুণ। ঠিকই পড়েছেন শতাংশ নয়, গুণ! এত প্রাচুর্যের মাঝে তবু কেন এত অনাহার আর অপুষ্টি? পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ সালে এদেশের ৪৩.৫ শতাংশ শিশুরই ওজন কম ছিল। চীনদেশে কম ওজনের শিশুর সংখ্যা ৪.৫ শতাংশ (২০০৫)। সব শিশু ও তাদের মায়েদের যদি পুষ্টিকর খাদ্য জোটে তাহলে ভারতের প্রায় অর্ধেক শিশু অপুষ্টিতে ভুগবে কেন? এর কারণ[৪]:

তারা প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। কেন?

ফসল উৎপন্ন হলেই তো হয় না। যার ক্রয়ক্ষমতা নেই সে বাজারের খাদ্যশস্য কিনতে পারেনা। তাই ১৯৬১ সালে যখন খাদ্য উৎপাদন হতো অনেক কম, তখন একজন ভারতবাসীর আহার জুটত দৈনিক গড়ে ৪৬৮.৭ গ্রাম ভাত-ডাল (অথবা ডাল-রুটি)। ২০০৯ সালে, প্রাচুর্যের সময়, তা কমে দাঁড়ায় ৪৪৪ গ্রামে। খাদ্যে ডালের পরিমাণ ৬৯ গ্রাম থেকে নামে ৩৭ গ্রামে। দেশের এক বিশাল নিরামিষাশী (প্রায় ৪২ শতাংশ) ও গরিব জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ডালই প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য, প্রোটিনের প্রধান উৎস।

খাদ্যের পরিমাণ কমল কেন? কারণ, বিশ্বায়ন-বিলাসী ভারত ১৯৯৫ সালের পর থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি করছে। দেশে ক্রেতা নেই তো কী হয়েছে? বিদেশে তো বাজার আছে। অপুষ্টির আরও দুটি কারণ— দুধ, ডিম, মাছের বাণিজ্যিকীকরণ ও জনসাধারণের এক বিরাট অংশের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কারণে এসব পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া; খাদ্যশস্যের আর এক অংশ (বিশেষ করে একটু নিকৃষ্ট মানের শস্য, যা গরীবদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে) এখন পশু-খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

মাছ, ডিম, দুধের বাণিজ্যিকীকরণ—

মাছ, ডিম, দুধের বাণিজ্যিকীকরণের সাথে 'সবুজ বিপ্লবে' বদলে যাওয়া কৃষি পদ্ধতির একটা সরাসরি যোগ আছে। সবুজ বিপ্লবের এক জরুরি উপাদান— রাসায়নিক কীটনাশক— মুখ্যত

৩। দাবি করা হয়— সবুজ বিপ্লবের ফলে এদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিও সফল হয়েছে। (যুক্তি, যে কৃষক কৃষিতে নূতন প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে সে সহজেই জন্মনিয়ন্ত্রণে নূতন পদ্ধতিতে স্বাগত জানিয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, L Brown: *Seeds of Change*, Praeger, 1970

৪। অপুষ্টির মূল কারণ নাকি কৃমি। শিশুরা খাদ্য ঠিকই পায়, কিন্তু কৃমি সব খেয়ে নেয়। যে দেশে ৬৫ শতাংশ গৃহে শৌচালয় নেই সে দেশে শিশুরা কৃমিতে আক্রান্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। পোলিও প্রতিরোধের মতো কৃমি প্রতিরোধেও কোনও কর্মসূচি নেই কেন? শিশুপ্রতি বছরে ২টি সস্তার বড়ি সরবরাহ করা কি খুব কঠিন?

দায়ী। ১৯৭০-৭১ সালে কৃষিতে ২৪,৩২০ মেট্রিক টন কীটনাশক প্রয়োগ হয়েছিল। ২০০২-০৩ ও ২০০৯-১০ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮,৩৫০ মেট্রিক টন ও ৮২,০০০ মেট্রিক টন। চার দশকে তিনগুণেরও বেশি। ১৯৭০-২০০২ এই সময়ে মোট ১৮,৩৯,১২১.৬২ মেট্রিক টন কীটনাশক ভারতীয় কৃষিতে প্রয়াগ হয়েছে, যা গোটা দেশের জলবায়ু দূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। গ্রামাঞ্চলে আত্মহত্যার প্রধান উপকরণও এই সহজলভ্য রাসায়নিক কীটনাশনক।

মাছ: দূষণের অন্যতম প্রধান শিকার মাছ। মাছের কয়েক হাজারে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে রাসায়নিক বিষে। সরকারি হিসেবে ১৯৫০-৫১ সালে মাছ উৎপন্ন হয়েছিল ৭৫২ হাজার টন, যা ২০১০-১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৮২৯০ হাজার টন। এটা আসলে বাজার-জাত মাছের হিসেব। সবুজ বিপ্লবের আগে বর্ষায় নদী নালায় ও ধান ক্ষেতে যে হাজার হাজার টন দেশীয় মাছ ধরা পড়ত চাষির জালে, যা বাজারে বিক্রি হতো না, বাড়িতে খাওয়া হতো, তার হিসেব সরকারি পরিসংখ্যানে ধরা নেই। ধরা থাকলে হয়ত দেখা যেত, গত পাঁচ দশকে মাছ উৎপাদন কমেছে।

ভূগর্ভের জলে টান পড়ায় ও সংস্কারের অভাবে অনেক খালবিল শুকিয়ে গেছে। মাছ চাষ এখন বাণিজ্যিক নিয়মে চলে। উন্নতমানের খাদ্য, হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক, হাইব্রিড পোনা— আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। সে মাছ কেনার খদ্দের গ্রামের বাজারে আর নেই। শহরের মুষ্টিমেয় বিত্তবান ছাড়া অন্যদের পাতে মাছ ওঠে কচিৎ-কদাচিৎ। উৎপন্ন মাছের এক বড় অংশ রপ্তানি হয় বিদেশে।

ডিম: মাছের মতই দেশি হাঁস-মুরগি প্রায় বিলুপ্তির পথে। সর্বত্রই তো বিষ ছড়ানো। তাই বেঁধে পালতে হয়। খাবার কিনতে হয়। খরচায় পোষায় না। মুরগি— এখন বাণিজ্যিক নিয়মে পালিন করতে হয়। সেই একই গল্প— 'উন্নত জাতের ডিমে' 'তা' দিলে বাচ্চা ফোটে না, তাই 'বার্ড' কিনতে হয়। সাথে খাবার, হরমোন প্রতিষেধক ইত্যাদি। গ্রামে ক্রেতা নেই, ক্রেতা শহরে।[৫]

দুধ: দুধ উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৯৫১ সালে উৎপাদন হতো ১.৭ কোটি লিটার। ২০০৭ সালে ১০.৭৯ কোটি লিটার। বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬.৩৪ গুণ। এই সময়ে গোরু মোষের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১.৫৩ গুণ। উৎপাদন এত বাড়ল কী করে? কারণ, দেশি প্রজাতির পরিবর্তে সংকর প্রজাতির গোরু-মোষের সংখ্যা বাড়ছে— উচ্চফলনশীল বীজের মত অধিক দুগ্ধ-দায়ী গোরু!!

দেশীয় প্রজাতির গোরু মাঠে চরে ঘাস খেত। মাঠে ফসল বোনা হলে মূল খাদ্য ছিল খড়-বিচালি। শুখা মরশুমে চাষ তাদের চারণভূমি কেড়ে নিল। কীটনাশক সবুজ ঘাসকেও রেহাই দিল না। বাজার থেকে গো-খাদ্য কিনে গো-পালনে কৃষক আর উৎসাহী হয় না। কৃষকের সন্তানেরা গো-দুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হতে থাকল। ঠিক সে সময়ে ঘোষণা হলো 'শ্বেত বিপ্লবে'র— 'অপারেশন ফ্লাড' (১৯৭০)[৬]। বিদেশি প্রজাতি, যেমন Holstein-Jersey, Red Dane, Brow Sweets গোরু মোষের সাথে ভারতীয় প্রজাতির মিলন ঘটিয়ে সংকর জাতীয় গোরু মোষ আস্তে আস্তে দেশীয় প্রজাতিদের হটিয়ে দিল। ১৯৯২-২০০৩ সময়কালে দেশীয় প্রজাতির সংখ্যা কমল ১৫ শতাংশ, তুলনায় অধিক দুগ্ধদায়ী সংকর প্রজাতির সংখ্যা বাড়ল ৬২ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকে উদারীকরণের পর, দুগ্ধশিল্পেও সরকার বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়। স্বভাবতই বাণিজ্যিক দুগ্ধ প্রকল্পে 'সংকর' প্রজাতির চাহিদা আরও বাড়ে।

এভাবেই দুধের বাণিজ্যিকরণের ফলে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুর কপালে আর দুধ-ভাত জোটে না। দুধ এখন প্যাকেটবন্দী হয়ে শহরের মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানের ঘরে ঘরে খবর-কাগজের মত বিলি হয় রোজ।

পশুখাদ্য: মাছ-দুধ-ডিমের মতো কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকরণের পর স্বভাবতই পশুখাদ্যের এক বিশাল বাজার তৈরি হয়। (যেখানে বাজার সেখানেই কেলেংকারি— লালুজিকে মনে পড়ে?) ''বাণিজ্যিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে'' পশুখাদ্য উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৫ সালে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, মাঝারি আকারের ফিড প্ল্যান্ট স্থাপনের পর (সালটা লক্ষ্য করুন। সবুজ বিপ্লবও একই সময়ে আরম্ভ হয়েছিল এদেশে)।

২০০৮-০৯ সালে দেশে পশুখাদ্যের বাজার ছিল আনুমানিক ৫.৫ কোটি টনের। মূলত তিন ধরনের উৎপাদনকারী পশুখাদ্যের যোগান দেয়। (ক) অসংগঠিত প্রস্তুতকারী (home mixer)— যারা বাজার থেকে কেনা খোল, ভুষি, নিকৃষ্টমানের শস্য ইত্যাদি বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে উপযোগী খাদ্য তৈরি করে, ৩২ শতাংশ বাজার এদের দখলে; (খ) দুগ্ধ-সমবায়গুলি নিজেরাই একই পদ্ধতিতে গোখাদ্যের যোগান দেয়, প্রায় ৪৫ শতাংশ পশুখাদ্যের যোগানদার এরা; (গ) বাকি ২২ শতাংশ যোগান দেয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো— যেমন হিন্দুস্থান লিভার (বর্তমানে হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, ১৯৯৭ সালে পশুখাদ্য বিক্রি বাবদ আয় করেছে ২৭২.২৮ কোটি টাকা)। খবরে প্রকাশ, খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের বহুজাতিক কোম্পানি কারগিল ভারতে ব্যবসা বিস্তারে উৎসাহী। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৮ সালে ভারত

৫। শহর ও গ্রামীণ ভারতবাসীর খাদ্য তালিকায় ডিম ও মুরগির মাংসের পরিমাণে তারতম্য প্রকট। গ্রামীণ ভারতীয় বছরে মাথাপিছু ডিম ও মুরগি খান যথাক্রমে ৭.৭টি ও ২৪০ গ্রাম। শহুরে ভারতীয় খান বছরে মাথাপিছু ১৭.৮টি ডিম ও ১.০৮ কিলো মুরগি।

৬। সবুজ বিপ্লবের মতো এখানেও মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দুধ শিল্পে ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

থেকে পশুখাদ্য রপ্তানি হয়েছে ১৬০০০ টন, আর আমদানির পরিমাণ ৭৭০০ টন। পশুখাদ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে অংশীদার আমরাও। কে বলে 'আদার ব্যাপারি'র জাহাজের খবরের দরকার নেই!

পেট্রোপণ্য, রাসায়নিক সার ও খাদ্যশস্যে সরকারি ভর্তুকি বাড়িয়ে কৃষি-পণ্যের বাণিজ্যিকরণ হয়েছে ঠিকই, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও কায়েম করা গেছে ভালোভাবেই। কিন্তু নাগরিকের এক বিশাল অংশের খাদ্য নিরাপত্তা হারিয়ে গেছে। আজ তারা অসহায়। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে খাদ্য বাজারে তারা আজ ব্রাত্য।

তারই প্রতিফলন ধরা পড়ছে রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI)। মানব-উন্নয়নের নিরিখে এক দশক আগে (২০০০) আমাদের স্থান ছিল ১২৮। বর্তমানে (২০১১) ১৩৪। পারমাণবিক শক্তিধর উজ্জ্বল ভারতের প্রদীপের নীচেই জমাট অন্ধকার! লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকির কেরোসিন বাতি এ আঁধার দূর করতে অক্ষম।

খ) জলের বাণিজ্যিকীকরণ

আমরা আগেই দেখেছি, নূতন কৃষি পদ্ধতিতে শুখা মরশুমে চাষে জলের যোগান দিতে সরকার ডিজেলে ভর্তুকি চাল করে। যেহেতু ষাটের দশকে খুব অল্পসংখ্যক গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল তাই ভূমি-জল তুলতে ডিজেল পাম্পসেটই ছিল চাষিদের ভরসা। ১৯৮৯-৯০ সালে সারা দেশে মোট ডিজেল ব্যবহারের (২.০৭ কোটি মেট্রিক টন) ৩০ শতাংশ (০.৬২ কোটি মেট্রিক টন) খরচ হতো সেচের পাম্পসেট চালাতে। সে অনুপাত ২০০৮-০৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে (পরিমাণ প্রায় একই— ০.৬২ কোটি মেট্রিক টন)। কারণ ততদিনে অধিকাংশ গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে এবং ডিজেলের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতেও ব্যাপক ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। ২০০৯-১০ সালে দেশে উৎপন্ন বিদ্যুতের ২০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে কৃষিকাজে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। কৃষিতে পাতাল-জলের ব্যবহার বাড়তে থাকায় দিনে দিনে মিষ্টিজলের স্বাভাবিক আধারগুলো সব নষ্ট হতে থাকে। অবহেলায় পুকুর, খাল বুজে যায়। চড়া পড়ে যায় বেঁধে দেওয়া নদী ও শাখা-নদীতে। জলের স্বাভাবিক যোগানে টান পড়ে। চাহিদা ও যোগানের এই ক্রমবর্ধমান পার্থক্য ভারত সহ সারা বিশ্বে জলকে পরিণত করে একটি 'আর্থিক পণ্যে' (Economic good)। আগে যা ছিল সহজলভ্য ও জীবজগতের সাধারণ সম্পত্তি (Common property), নতুন কৃষি পদ্ধতিতে তা রূপান্তরিত হয় বাজার নিয়ন্ত্রণাধীন এক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে, যার দাম বাড়লেও চাহিদা খুব একটা কমে না। (বিস্তারিত জানতে দেখুন *অনীক*, সেপ্টে-অক্টোবর ২০০৯)।

জল যখন এক অপরিহার্য অর্থকরী সম্পদ, তখন দেখা যাক আমরা (এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ) কী ভাবে এ সম্পদ রক্ষা করছি। (সারণি ১ দেখুন)

সারণি-১

দেশ	১৯৮৭-৯৭	২০০৩-০৭	২০০৮-১২
ভারত	৩৯.৭	—	৪০.১
চীন	১৮.৭	১৯.৫	—
নেদারল্যান্ড	৭১.০	১২.৬	১১.৭
মার্কিন দেশ	১৮.২	১৫.৬	—
জার্মানি	৪৩.২	২১.০	—
ফ্রান্স	২২.৬	১৫.০	—
হল্যান্ড	৬.৪	৮.৮	—

সূত্র : ইউএনডিপি, মানবোন্নয়ন রিপোর্ট ২০০০, ২০১১

সারণিতে বর্ণিত পরিসংখ্যান পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে—

(১) ভারত জলের মতো অর্থকরী সম্পদ ব্যবহারে যত্নবান নয়;

(২) চীন কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ হয়েও জলসম্পদ রক্ষার্থে অধিক সফল;

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ বিশেষ করে নেদারল্যাণ্ড ও ইংল্যান্ড পরিকল্পিতভাবে জল জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্য। কীভাবে? তাদের এই জল পরিকল্পনায় ভারতের ভূমিকাই বা কী তা আমরা আলোচনা করবো শেষ অধ্যায়ে।

গ) দুয়োরানী কয়লা

ভর্তুকির জাঁতাকলে সবচেয়ে মার খেয়েছে কয়লা, যা ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেলে। পেট্রোপণ্যে ভর্তুকির সুবাদে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রথম পাঁচ দশকে কয়লা কোণঠাসা হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। মার্কিন উদ্যোগে (Marshal Plan) ভারত সহ সারা বিশ্বে খনিজ তেল তখন সুয়োরানি। নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরবে।

সারণি-২

ভারতে বিভিন্ন জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা হার কীভাবে পাল্টাচ্ছে

	১৯৬০-৬১	১৯৯০-৯১	২০০১-০২	২০০৯
কয়লা	৭৪.১	৩৯.০	৩৪.৬৫	৪২.০
তেল ও গ্যাস	২০.৯	৪৩.৪	৩০.৬৫	৩০.৬৫
অন্য	৫.০*	১৭.৬	৩৪.৭০**	২৭.০**

সূত্র: বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যান।

* ১৯৬০ সালে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে কত কাঠ ও খড়কুটো রান্না বা শবদাহ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হতো তার সঠিক হিসাব নেই— থাকলে অনুপাতটা বাড়ত

** (কাঠ, ভুষি ইত্যাদি) Consumable renewable waste 31.76% + (বায়ু, জল, সৌর ইত্যাদি) Other renewables 1.8% + Uranium (Nuclear) 1.18% = 34.70%

*** Consumable renewable waste 24% + other renewables 2% + Uranium (nuclear) 1% = 27.0%

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ২০০১-০২ সাল পর্যন্ত কয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে, উদারিকরণের আগে পর্যন্ত (১৯৯০-৯১) পেট্রোপণ্যের গুরত্ব বেড়েছে। ১৯৬০-১৯৯০ সালের তিরিশ বছরে কয়লা (ভারতে যার অপর্যাপ্ত ভাণ্ডার) কোণঠাসা হয়েছে পেট্রোপণ্যের কাছে— যা ভীষণভাবে আমদানি নির্ভর।

কয়লা বা পেট্রোপণ্য শুধু জ্বালানিই নয়, সার উৎপন্ন করতেও ব্যবহার করা হয় feed stock হিসাবে। এই দুই ক্ষেত্রে (জ্বালানি ও রাসায়নিক সার উৎপাদনে) পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি কীভাবে কয়লার ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করেছে ক্ষেত্রে তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব ।

রান্না ও শিল্পে জ্বালানি

১৯৭৮-৭৯ সালে সরকারি পরিসংখ্যান মতে গ্রামে রান্নার জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ছিল মোট জ্বালানির ২ শতাংশ। আর শহরে এই অনুপাত ছিল ২২ শতাংশ। ২০০৪-০৫ সালে গ্রামে ও শহরে রান্নার কাজে কয়লা ব্যবহার উঠে গেল! (সারণি ৩ দেখুন)

সারণি-৩

রান্নার জ্বালানি ব্যবহারে শতকরা হার (১৯৯৮-২০০৫)

	গ্রাম		*শহর*	
	১৯৭৮-৭৯	২০০৪-০৫	১৯৭৮-৭৯	২০০৪-০৫
কাঠ	৫৬	৭৫.৩	৩১	২১.৭
কেরোসিন	৩	১.৩	২৮	১০.২
গোবর-ঘুঁটে	২০	৯.১	৪	১.৭
এলপিজি	-	৮.৬	১০	৫৭.২
খড়কুটো	১৯	-	২	-
কয়লা	২	-	২২	-
অন্যান্য	১	৫.৮	-	৯.১

তথ্যসূত্র : ভারত সরকারের বিভিন্ন নথি

এলপিজি সিলিন্ডারে যদি সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি না দিত (২০০৩-২০০৪ এই ছয় বছরেই ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৬৭,৯৫৫ কোটি টাকা) তাহলে এলপিজি-র পরিবর্তে গ্রামে ও শহরে উন্নতমানের কয়লা ও কোলগ্যাসের ব্যবহার বাড়ত।

সত্তরের দশকে সরকার কয়লাখনি জাতীয়করণের মাধ্যমে এই অতিপ্রয়োজনীয় দেশীয় জ্বালানিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ জারি করলো। শুধু তাই নয়, পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি বাড়িয়ে সরকার যখন কেরোসিন, এলপিজি, ডিজেল, ন্যাপথাকে সহজলভ্য করে তুলল, সে সময় রাষ্ট্রীয় সংস্থা কোল ইন্ডিয়া কয়লার দাম বাড়িয়ে চলল বছরের পর বছর।[৭]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গ্রাম-শহর সর্বত্রই রান্নায় কেরোসিনের চল কমেছে। ভর্তুকি প্রাপ্ত পিডিএস কেরোসিন গেল কোথায়? কারা লুঠল সরকারি টাকা? পিডিএস কেরোসিন-এ ভর্তুকির পরিমাণ কম নয়— ২০০৩-২০০৮ সময়কালে তার পরিমাণ ৯২৮২৫ কোটি টাকা। সরকার বলছে, পিডিএস কেরোসিন মূলত আলো জ্বালাতে ব্যবহার হয়। ২০১১ সালে গ্রামে ৪৩ শতাংশ ও শহরে ৬.৫ শতাংশ গৃহে কেরোসিনের বাতি জ্বলেছে। বাকিরা জ্বালিয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি। হবে হয়তো! গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ রান্না তো এখনও কাঠ-ঘুঁটে নির্ভর। পিডিএস কেরোসিন ও এলপিজি ভর্তুকির একটা অংশ কি উন্নত মানের কয়লা বা ধোঁয়াহীন গুল গ্রামের রান্নাঘরে পৌঁছে দিতে খরচ করা যেত না? গণবণ্টন ব্যবস্থায় কেরোসিন বিপণন সম্ভব হলে কয়লাও করা যেত। অবশ্য চাল, আটা থেকে দুধ, মাছ, ডিম সবই এখন শহরমুখী। ঘরে আর আছেই বা কী যে রাঁধবে! গ্রামের ১০ শতাংশ বিত্তশালীর হেঁসেলে এলপিজি/কেরোসিন পৌঁছে গেছে কবেই। শহরের যে ৭০-৭৫ শতাংশ গৃহে ভর্তুকি প্রাপ্ত কেরোসিন বা এলপিজি-তে রান্না হয় তা কোল গ্যাসেই সারা যেত।

গত শতকের সত্তরের দশকে যখন বিশ্বব্যাপী খনিজ তেলের দাম খুব বেড়ে গেল, তখন একবার ভাবা হলো দেশের অপর্যাপ্ত কয়লার সদ্ব্যবহার করা যাক। সিদ্ধান্ত হলো, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তরিত করে গৃহস্থের গৃহে ও কলকারখানায় সরবরাহ করা হবে। গ্যাস উৎপাদনের পর কয়লার পরিত্যক্ত অংশটি ধোঁয়াহীন গুল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। খুবই উত্তম প্রস্তাব। তৎকালীন কয়লা মন্ত্রী বরকত গণি খান সাহেবের উদ্যোগে কলকাতার উপকণ্ঠে স্থাপিত হলো ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স (DCC)। সেটা ১৯৮৯ সাল। DCC, কোল ইন্ডিয়া-র অধীনস্থ একটি সংস্থা। ঠিক হলো, কোল ইন্ডিয়া কয়লা সরবরাহ করবে। ডিসিসি তা কোল গ্যাসে রূপান্তরিত করবে। আর সে গ্যাস কলকারখানায় ও গৃহস্থের রান্নাঘরে সরবরাহ করবে রাজ্য সরকারের সংস্থা গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন (GCGSC)। এই GCGSC আদতে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানিজ আন্ডারটেকিং (OGCU) নামে একটি সংস্থার (যারা ১৮৫৭ সালে কলকাতায় গ্যাসের বাতি জ্বালাতো) উত্তরসূরী। ডিসিসি এখন লোকসানে ধুঁকছে। অন্যান্য বিবিধ প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও একটা বড়ো কারণ এলপিজি আর ডিজেলে ভর্তুকি। কলকারখানা সস্তায় ডিজেল পেলে কোলগ্যাস ব্যবহার করবে কেন? গৃহস্থেরও একই প্রশ্ন। সস্তায় এলপিজি, পিডিএস-কেরোসিন তার হাতের নাগালে। ইংরাজিতে যাদের বলে 'Low hanging fruits'!

৭। মাঝে মাঝে মনে হয় কয়লা শিল্প জাতীয়করণ না হলে হয়ত পেট্রোপণ্য এত সহজে এদেশে প্রধান জ্বালানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হত না!

পরিসংখ্যান বলছে মোট ডিজেল ব্যবহারের আনুমানিক ১০ শতাংশ কলকারখানায় ব্যবহৃত হয়। ২০১২-১৩ সালের মোট ডিজেল ভর্তুকির (আনুমানিক ১,০৩,০০০ কোটি টাকা) ১০ শতাংশ ১০,৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতো যদি শিল্পে ডিজেলের পরিবর্তে কয়লাজাত গ্যাস-অয়েল সরবরাহ করা হতো।

সরকার বলছেন, তাঁরা নাকি নিরুপায়, কারণ খনিজ তেলের প্রয়োজনের প্রায় ৭৪ শতাংশ আজ আমদানি করতে হয়। সত্যিই আজ আমরা নিরুপায়। প্রশ্ন জাগে, যদি তেল সংস্থাগুলো সরকারের আওতায় না থাকত তবে হয়ত তেল শিল্পের প্রতিটি স্তরে— অন্বেষণ, খনন, শোধন ও বিপণনে— এতটা বিদেশি প্রভাব থাকত না। ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ চলতো না এত কাল![৮]

কয়লা ভিত্তিক সার উৎপাদন? সর্বনাশ করেছে!

'সবুজ বিপ্লবের' অন্যতম প্রধান উপকরণ রাসায়নিক সার। সার উৎপাদনে ব্যবহার হয় পেট্রোপণ্য, মূলত ন্যাপথা (পরবর্তীতে ন্যাপথার পরিবর্তে প্রধান ফিড স্টক রূপে পৃথিবী ব্যাপী ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস)। গত পঞ্চাশের দশকেই ভারত-স্থিত বিদেশি তেল সংস্থাগুলি রাসায়নিক সার উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে পড়ে। সে দশকে যে তিনটি শোধনাগার তারা স্থাপন করেছিল এদেশে সেগুলো ন্যাপথা উৎপাদন করত বেশি। তাই ১৯৭০ সালে চাহিদার চেয়ে ন্যাপথার যোগান ছিল বেশি। উদ্বৃত্ত ৩২৯ হাজার টন। এদিকে সারের চাহিদা বাড়ছে দিন দিন। উৎপাদন বাড়ানো আশু প্রয়োজন। কিছুদিনের মধ্যে খবর হলো সিন্ধ্রিতে সরকারি একদল বিজ্ঞানী কয়লাভিত্তিক সার উৎপাদনের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, হাতে-কলমে হিসেব কষে দেখিয়েছেন, কয়লাভিত্তিক সার উৎপাদন ব্যবসায়িক ভাবে লাভজনক। আসামে আগেই প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার হয়েছিল। এবার আরব সাগরেও গ্যাস আবিষ্কার হলো।

সরকারের কাছে তিনটি পথ খোলা— (১) তৈল শোধনাগারের কাছে ন্যাপথা ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন, (২) কয়লা খনির আশেপাশে কয়লা ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন, (সিন্ধ্রি সার কারখানা কয়লা ভিত্তিক হবে এমনই পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পরে তা বদলে গেল)[৯], (৩) গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন। সে সময়ে তৃতীয় পথটি খুব একটা সহজ ছিল না কারণ আসামে সারের চাহিদা কম। আসামে গ্যাস থেকে সার উৎপাদন করে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে, যে অঞ্চলে চাহিদা বেশি, বয়ে আনাটা খরচ সাপেক্ষ। সাগর থেকে পাইপলাইনে গ্যাস টেনে আনাও সময় সাপেক্ষ। (তাই ১৯৭০ সালে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ৫২.৭৭ শতাংশ আমরা উৎসমুখেই জ্বালিয়ে নষ্ট করতাম। ১৯৮৯-৮৮ সালেও দেশে উৎপাদিত ৩০.০১ শতাংশ গ্যাস— ৩৪৪ কোটি কিউবিক মিটার— স্রেফ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে।)

রাষ্ট্রের সামনে এবার দুটো পথ— ন্যাপথা না কয়লা। পেট্রোলিয়াম লবিরই জয় হলো। 'কৃষকের স্বার্থে' (পড়ুন কয়লাকে হটাতে) সরকার ন্যাপথার দ্বৈত মূল্য ঘোষণা করল। সার উৎপাদনে ব্যবহৃত ন্যাপথার দাম হবে কম, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহৃত ন্যাপথার দাম পড়বে বেশি। বিদেশি তেল লবির এতে একই ঢিলে দুই পাখি মারা হলো। তাতে ভারতের সার শিল্প কয়লার পরিবর্তে পেট্রোলিয়াম-নির্ভর হলো, আর দেশীয় পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের বিকাশও খানিকটা পিছিয়ে গেল। তাদের ন্যাপথা আমদানি করতে হবে। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে কয়লা ন্যাপথার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তাই দাম বেশি হলেও বাছাধনকে পেট্রোপণ্য নির্ভর হতেই হবে। একটা উদাহরণ দিলে খেলাটা স্পষ্ট হবে।

১৯৭৬ সালে ভারতে ন্যাপথা উৎপাদনে খরচ হতো ৮৪০.৯০ টাকা প্রতি মেট্রিক টন। সরকার সার উৎপাদনে ব্যবহৃত ন্যাপথার দর বাঁধলেন মেট্রিক টন প্রতি ৬৯৭ টাকা আর পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য মেট্রিক টন প্রতি ১১৩২ টাকা। এরই নাম Cross subsidization— মাছের তেলে মাছ ভাজা! ফার্নেস তেলের ক্ষেত্রেও সরকার তাই করেছেন— সার কারখানার জন্য কম দাম, অন্যদের ক্ষেত্রে বেশি। ১৯৮৬ সালে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য ন্যাপথার দাম একলাফে বাড়িয়ে দেওয়া হলো প্রতি মেট্রিক টনে ৩,৪০০ টাকা, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে ন্যাপথার দাম ছিল প্রতি মেট্রিক টনে ১৫০০ টাকা। এই অসম ব্যবস্থায় ভারতীয় পেট্রোকেমিকেল শিল্প বিদেশি বহুজাতিকের সাথে লড়বে কীভাবে? তারা আরও কোণঠাসা হলো।

সরকারি বদান্যতায় ১৯৬৯-১৯৮৯ সালের মধ্যে বিশ বছরে দেশে ন্যাপথার চাহিদা বাড়ল পাঁচগুণ। ৬,৬৫,০০ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৩৩,৪৯,০০০ মেট্রিক টন। এর ৬৯ শতাংশ গেল সার কারখানায়। ২৯ শতাংশ পেলো পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প। ১৯৯৮-৯৯ সালে সার কারখানায় ৫৩ শতাংশ, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ১৯.৪ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে ন্যাপথার পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস হয়েছে রাসায়নিক সারের মূল ফিড স্টক (গ্যাস ৮৩.৩ শতাংশ, ন্যাপথা ৬.৯ শতাংশ, ফার্নেস

৮। বিস্তারিত জানতে দেখুন, Dipankar Dey, 1999, State anf Foreign Involvement in the Development of Indian Petroleum Industry between 1970 and 1989, C.U. (PhD Thesis)

৯। ১৯৭১ সালে কোল ইন্ডিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের রামাগুন্ডমে কয়লাভিত্তিক সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় একই সময়ে উড়িষ্যার তালচেরে আরও একটি কয়লাভিত্তিক সার কারখানা স্থাপিত হয়। দুটি উদ্যোগই এখন রুগ্ন।

অয়েল ৯.৮ শতাংশ)। উৎপাদিত ন্যাপথার ৭৭.৩ শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে, সার উৎপাদনে মাত্র ৭.৭ শতাংশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হচ্ছে ন্যাপথার ১২.৯ শতাংশ।

ন্যাপথার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আশির দশকে বিশ্বব্যাংক দু'বার ঋণ দিল নতুন প্রযুক্তি আমদানি করতে, যাতে তেল শোধনাগারগুলো বেশি পরিমাণে ন্যাপথা উৎপাদন করতে পারে। এদিকে ভর্তুকির সুবাদে দেশে পিডিএস কেরোসিন ও ডিজেলের চাহিদাও বেড়েছে। শোধনাগারগুলোর তখন উচিত ছিল এমন প্রযুক্তি আমদানি করা যাতে কেরোসিন ও ডিজেলের উৎপাদন বাড়ানো যায়। তা না করায় বাড়তি চাহিদা মেটাতে কেরোসিন ও ডিজেল আমদানি করতে হলো। এমনিতেই খনিজ তেল আমদানি হচ্ছিল। সাথে পেট্রোপণ্যও যোগ হলো।

বিদেশি নির্ভরতা নতুন নয়। এর শিকড় অনেক গভীরে। রাষ্ট্র-নেতারা একে উপড়ে ফেরার চেষ্টা করেন নি কোনদিন। ভারত সার উৎপাদনে কয়লাকে বাতিল করলেও চীন করেনি। সে দেশে ছোটো মাঝারি বহু কয়লাভিত্তিক সার কারখানা কৃষকের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে।[১০]

একবার ভাবুন তো, চার দশক আগে যদি কয়লা ভিত্তিক সার উৎপাদন হতো আর ডানকুনির কোল গ্যাস ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত— এতটা বিদেশ নির্ভরতা থাকতো কী আমাদের? যে দেশ চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা করে, আণবিক শক্তির 'সফল' বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে সত্তরের দশকেই, সেই দেশই গত পাঁচ দশক ধরে খনিতে মজুত লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়ে যেতে দেয় সবার অলক্ষ্যে। কোন তাগিদ নেই খনির আগুন নেভাবার। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা সবই আমরা পোড়াচ্ছি। আর, দেশের ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদা মেটাতে আমদানি বাড়াচ্ছি প্রতিবছর। ১৯৭০-১৯৭১ সালে মোট চাহিদার ২৯ শতাংশ আমদানি করতে হতো। ২০১০-১১ আমদানি হয় ৪৪ শতাংশ।

ঘ) কোণঠাসা রেল

রাষ্ট্রের ডিজেল ও সড়ক প্রীতির মাসুল দিচ্ছে রেল। শুধু সড়ক প্রীতিই নয়, সরকার রেলের উন্নতিকল্পে তেমন কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৫০-৫১ সালে দেশে রেললাইন ছিল ৫৩.৬ হাজার কিলোমিটার। পাঁচদশক পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪.৪ হাজার কিলোমিটার। পঞ্চাশ বছরে মাত্র ২০ শতাংশ বৃদ্ধি। কিন্তু সড়ক নির্মাণ হয়েছে খুব দ্রুততার সঙ্গে। সন্দেহ নেই, উন্নয়নে সড়কের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫০-৫১ থেকে ২০০৭-০৮, এই ৫৭ বছরে সড়কের বিস্তার হয়েছে ১০ গুণের একটু বেশি (৩৩৯.৯ হাজার কিলোমিটার থেকে ৪১০৯.৬ হাজার কিলোমিটার)। ২০০২ সালে ৫৪,০০০ কোটি টাকার এক সড়ক নির্মাণ প্রকল্প চালু করেছে সরকার যার আনুষ্ঠানিক নাম 'Golden quadrilateral' (সোনালি চতুর্ভূজ)। দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩,১৫১ কিলোমিটার। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই রেলের প্রতি সরকারের উদাসীনতা প্রকট হবে। ২০০৬ সালের বাজেটে রেল ফ্রেট করিডর নির্মাণে বরাদ্দ হয়েছিল ২০,০০০ কোটি টাকা। একই বাজেটে সড়ক নির্মাণে বরাদ্দ ছিল ১,৭৫,০০০ কোটি টাকা।

রেললাইন সম্প্রসারণ না হওয়ায় রেল পরিষেবার বিস্তার সম্ভব হচ্ছে না। এর সুযোগ নিচ্ছে সড়ক পরিবহন। ১৯৫০-৫১ সালে রেল দেশের ৮৯ শতাংশ পণ্য বহন করত। বাকি ১১ শতাংশ পণ্য বইত সড়ক পরিবহন। দৃশ্যটা পুরো বদলে গেছে। ২০০৩-০৪ সালে পণ্য পরিবহনে রেল আর সড়কের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৩৯:৬১। অনুমান করছি, হালে এই অনুপাত রেলের আরও বিরুদ্ধেই গেছে। রেলকে কোণঠাসা করা হয়েছে, যদিও বার বার প্রমাণিত হয়েছে সড়ক পরিবহনের তুলনায় রেল অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয়কারী। তাছাড়া, রেলের তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনার অনুপাত অন্তত কুড়িগুণ বেশি।

একটা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৩ সালে দেশে পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত মোট ডিজেলের ৮৮ শতাংশ ব্যবহার হয়েছে ট্রাকে ডিজেল বাহিত পণ্যের ৫৯ শতাংশ পরিবহনে। বাকি ডিজেল বাহিত পণ্য (৪১ শতাংশ) রেল বহন করেছে, মোট ডিজেলের মাত্র ১২ শতাংশ ব্যবহার ক'রে। তারপরেও রাষ্ট্র ডিজেলে ভর্তুকি দেয় কার স্বার্থে?

১৯৮৯-৯০ থেকে ২০০৮-০৯ এই দুই দশকে এ দেশে ডিজেলের ব্যবহার (আনুপাতিক হার) কেমন বদলেছে দেখা যাক।

১৯৮৯-৯০ : ট্রাক (৪২ শতাংশ) সেচপাম্প (৩০ শতাংশ), বাস (১৭ শতাংশ), রেল (৮ শতাংশ), অন্যান্য (৩ শতাংশ)

২০০৮-০৯ : ট্রাক (৩৭ শতাংশ), বাস (১২ শতাংশ), যাত্রীবাহী অন্য গাড়ি (১৫ শতাংশ), জেনারেটর (৮ শতাংশ), কৃষিকাজে (১২ শতাংশ), রেল (৬ শতাংশ), শিল্পক্ষেত্রে (১০ শতাংশ)

১০। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে, সে সময়ে চীন দেশে মূলত তিন ধরনের (বড়, মাঝারি ও ছোট) কারখানায় রাসায়নিক সার উৎপাদন হতো। বিদেশি প্রযুক্তিনির্ভর বড় কারখানাগুলো মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক। দেশীয় প্রযুক্তি নির্ভর মাঝারি ও ছোট কারখানাগুলিতে মূলত কয়লা ভিত্তিক সার উৎপাদন হতো। মাঝারি ও ছোট সার কারখানায় ফিড স্টক হিসাবে ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৬৬.২২ শতাংশ ও ৯৬.১ শতাংশ। (সূত্র: Wang Wenshan, China Nitrogen Fertiliser Association) ২০০৯ সালে বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদক চীন ৪.৮৬৭ কোটি টন নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করে। উৎপন্ন সারের ৭৬.৪ শতাংশই কয়লা ভিত্তিক। (সূত্র: China Nitrogen Report, Fertilizer Deptt, China National Chemical Information Centre, May 2011)

দেখা যাচ্ছে, ইদানিং যাত্রীবাহী অন্যগাড়ি ও জেনারেটর চালাতে এবং কলকারখানায়ও সস্তার ডিজেল ব্যবহার হচ্ছে ভালো পরিমাণে। সড়কপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে ১৯৮৯ সালে ৫৯ শতাংশ ডিজেল ব্যবহৃত হতো। দু দশক পর সড়ক পরিবহনে খরচ মোট ডিজেলের ৬৪ শতাংশ। বর্তমান বর্ষেও (২০১২-১৩) অনুপাতটা একই আছে ধরে নিলে সড়ক পরিবহনে ডিজেল ভর্তুকি বাবদ খরচ হবে আনুমানিক ৬৫,৯২০ কোটি টাকা (১,০৩,০০০ কোটি টাকা ডিজেল ভর্তুকির ৬৪ শতাংশ)। রেলের সুরক্ষায় ও আধুনিকীকরণের জন্য নাকি আগামী পাঁচ বছরে তিন লক্ষ কোটি টাকা প্রয়োজন (অর্থাৎ বছরে ৬০,০০০ কোটি টাকা)। আজ যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে সড়ক পরিবহনের তুলনায় রেল পরিষেবা অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয়কারী, কম দুর্ঘটনাপ্রবণ ও পরিবেশ বান্ধব, তখন সড়ক পরিবহনে রাষ্ট্র ৬৫৯২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিলে রেল পরিষেবার উন্নতিতে বছরে ৬০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে না কেন?

রেল বাজেটের আগে রেলের 'সুরক্ষা ও আধুনিকীকরণের' দোহাই দিয়ে যাত্রী ও পণ্যমাশুল বৃদ্ধির যুক্তি দেওয়া হচ্ছিল। ভাড়া না বাড়ালে ভারতীয় রেলের ভবিষ্যৎ বিপন্ন— এমন একটি প্রচার খুব সুচতুরভাবে চালানো হচ্ছিল ভাড়া ও মাশুল বাড়ানোর পক্ষে জনমত গঠনের তাগিদে। সরকার সফলও হয়েছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত খেটে-খাওয়া মানুষও রেল ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। অধ্যাপক দেবনারায়ণ সরকার হিসেব কষে দেখিয়েছেন (*দৈনিক স্টেটসম্যান* ৯.৮.২০১২), প্রস্তাবিত ভাড়া বাড়িয়ে রেলের আয় বাড়ত মাত্র ৪০০০ কোটি টাকা। আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন তো বছরে প্রায় ৬০,০০০ কোটি টাকা। বাকি টাকা যোগাত কে? এই সহজ হিসেবটা রেলমন্ত্রক বা সরকারের অজানা নয়। তবু একটা মিথকে নির্মাণ করতে হয়েছিল ভাড়া বাড়ানোর স্বপক্ষে, যাতে ডিজেলের দাম বাড়ানো যায়। রেলভাড়া না বাড়লে সড়ক পরিবহনে পণ্যমাশুল ও যাত্রীভাড়া বাড়ানো যাবে না। ডিজেল লবি মার খাবে। রেল পরিষেবা বেশি জনপ্রিয় হবে।

Engineering of Consent বা সহমত নির্মাণ তত্ত্বের প্রবক্তা ফ্রয়েডের ভাইপো এডোয়ার্ড বার্নেস-র কথা উল্লেখ করেছিলাম। ওঁর আর একটা কীর্তির কথা বলি। মার্কিন সিগারেট ব্যবসায়ীরা ১৯২০-এর দশকে বার্নেসকে বলে, মেয়েরা যদি সিগারেট খায় তাহলে বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়— একটা উপায় বলো। মেয়েদের সিগারেট টানার চল তখন সেদেশেও হয়নি। বার্নেস ১৯২৯ সালে নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত ইস্টার প্যারেডে কয়েকটি মেয়ে-মডেলকে স্বাভাবিক মধ্যবিত্তে পোশাকে হাঁটিয়ে দিল। মুখে তাদের জ্বলন্ত সিগারেট, হাতে প্ল্যাকার্ড 'Torch of Freedom'। সিগারেট ফোঁকা হয়ে উঠল নারী স্বাধীনতার প্রতীক! বাকিটা ইতিহাস। এভাবেই নাগরিকের সহমত নির্মাণ করা হয় কখনও স্বাধীনতার নামে, কখনও দারিদ্র্য দূরীকরণের ছুতোয়, কখনও বা আশংকার অর্থব্যবস্থা (Economy of apprehensions)[১১] নির্মাণে!

৩) পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি হ্রাসের কারণ

সদ্যস্বাধীন ভারতরাষ্ট্র ষাটের দশকে 'সবুজ বিপ্লব' ও খনিজ তেলের হাত ধরে খাদ্য ও জ্বালানিতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। তার সহযোগী ছিল বিদেশি তেল ও রাসায়নিক সারের কারবারিরা। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে কৃষিপ্রধান ভারতের প্রায় প্রতিটি পণ্য ও কৃষি সরঞ্জামের বাণিজ্যকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বায়নের পর আন্তর্জাতিক পুঁজির রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা কমেছে। রাষ্ট্রকে তার আর খুব একটা প্রয়োজন নেই। পাঁচ দশক আগে রাষ্ট্রকে সহযোগী করার মূল কারণ তখন বেসরকারি দেশীয় পুঁজির বাল্যদশা। দেশীয় পুঁজিপতিরা এখন সাবালক হয়েছে। রিলায়েন্স এসার-এর মত সংস্থা এখন পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে বড় অংশীদার। ভর্তুকি প্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোপণ্য বিপণন সংস্থার সাথে বাজারে লড়তে পারছে না তারা। উৎপাদিত পেট্রোপণ্য (বিশেষ করে ডিজেল) রপ্তানি করতে হচ্ছে তাদের। কেরোসিন, ডিজেলে ভর্তুকি না কমলে বেসরকারি শোধনাগারে উৎপন্ন ডিজেল কেরোসিন দেশীয় বাজার ধরতে পারবে না। রাষ্ট্র এখন দেশি-বিদেশি উভয় পুঁজিরই পথের কাঁটা। দুপক্ষই এবার রাষ্ট্রকে কোণঠাসা করতে চাইছে। ভর্তুকি যত কমবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তত আলগা হবে। বিদেশি পুঁজির সহযোগী এখন দেশীয় পুঁজি।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র বুঝতে পেরেছে, খোলা বাজারের নিয়মে পেট্রোপণ্যকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। উদারীকরণের পর গত দু'দশকে কয়লার গুরুত্ব উল্লেখকজনকভাবে বেড়েছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় আড়াই গুণ। (১৯৯০-৯১ : ২২.৫৫ কোটি টন, ২০০৯-১০ : ৫৬.৬১ কোটি টন)। বেসরকারি শিল্প সংস্থা কয়লার মজুতদারিতে উৎসাহিত হচ্ছে (Coalgate স্মরণীয়!)। খবরে প্রকাশ, কোল ইন্ডিয়া উড়িষ্যার তারচেরে তাদের কয়লা ভিত্তিক রুগ্ন সার কারখানাটি আবার পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোগী হয়েছে।

রাষ্ট্র ঠিক বুঝতে পেরেছে সবুজ বিপ্লবের ভেলকি শেষ। সার প্রয়োগ বাড়িয়েও উৎপাদন আর বাড়ানো যাচ্ছে না। ১৯৭০-৭১— ২০১০-১১, এই চার দশকে রাসায়নিক সার প্রয়োগ বেড়েছে ১২.৯ গুণ, কিন্তু কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ২.১৯ গুণ। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা ভাবা হচ্ছে। এবার উদ্যোক্তা মনস্যান্টোর মতো বহুজাতিক বীজ সংস্থা। তারা বলছে, আগের প্রযুক্তিতে হবে না। নতুন বীজ চাই যা বায়ু থেকে প্রয়োজনীয়

১১। বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'আশংকার রাজনৈতিক অর্থনীতি', দীপঙ্কর দে, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, ডিসেম্বর, ২০০৯

খাদ্য, যেমন নাইট্রোজেন, জোগাড় করতে পারবে। রাসায়নিক সার দরকার হবে কম। পোকামাকড়, আগাছার উৎপাতও নাকি এই জিন-পরিবর্তিক বীজ রুখে দিতে সক্ষম।

আদতে এই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব প্রথম সবুজ বিপ্লবেরই পরিপূরক। মূল কাণ্ডারীদের জায়গা বদল হয়েছে মাত্র। প্রথম সবুজ বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল বহুজাতিক তেল কোম্পানি, সহযোগী ছিল সার, বীজ ও কীটনাশক প্রস্তুতকারীরা। এবার বীজ কোম্পানিগুলো মূল উদ্যোক্তা। প্রধান সহযোগী বায়োইফর্মেটিক্স কোম্পানি (বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেট্স ফাউন্ডেশন) ও কীটনাশকের দল।

তেল সংস্থারা সরলো কেন? কারণ জ্বালানি তেল শিল্পে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে গত চার দশকে। মুষ্টিমেয় বহুজাতিক সংস্থার একচেটিয়া আধিপত্য আর নেই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বহুজাতিক তেল সংস্থাগুলো নিজেদের পুনর্গঠন করছে, বিস্তার করছে অন্য শিল্পে। যেমন বেকটেল্স, যা মূলত ছিল জ্বালানি তেল পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, এখন জল পরিষেবা সংস্থা হিসেবে বেশি পরিচিত। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, *অনীক*, সেপ্টে-অক্টোবর ২০০৮)। খনিজ তেল বিংশ শতাব্দীর জ্বালানি, সে এখন অস্তমিত। একবিংশ শতাব্দীতে ভারত রাষ্ট্র বিকল্প শক্তির হাত ধরে নিজেকে আরও শক্তিধর করে তুলতে চাইছে। পরমাণু ও সৌরশক্তি, যা ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন, এখন তার চোখের মণি। পেট্রোপণ্যকে জনপ্রিয় করার আর কোন তাগিদ নেই রাষ্ট্রের।

৪) খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজি ও ভাত-রুটির যোগান

ওয়ালমার্টের মতো বহুজাতিক সংস্থা ভারতের কৃষকের উন্নতিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী— এ যুক্তি যারা দিচ্ছেন তারা হয় কল্পনাবিলাসী অথবা অন্যদের মূর্খ ভাবেন। বহুল-প্রচারিত দৈনিকে ছবি এঁকে দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের দালালদের হটিয়ে দিয়ে বহুজাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা সরাসরি কৃষকের থেকে সবজি কিনলে কৃষক ও ক্রেতা দুপক্ষেরই কত লাভ! কৃষক ফসলের বেশি দাম পায় আর ক্রেতা কম দামে সবজি কেনে। বেগুনের উদাহরণ দেওয়া হলো দেখলাম। কৃষক ৩০ টাকা প্রতি কিলো বেগুন বেচলেন প্রথম দালালের (ফড়ে) কাছে। দু-তিন বার হাত বদল হয়ে শহরে ক্রেতার কাছে বিক্রি হলো ৬০ টাকায়। দালালরা মাঝপথে অনেক টাকা 'খেয়ে' নিল। ধরুন, আমি ওয়ালমার্ট বা তার কোন ভারতীয় সহযোগীর প্রতিনিধি। ভোররাতে গ্রামের হাটে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলাম। দালালরা সব গত হয়েছে। গত ক' মাসে আমার ক্রয় ক্ষমতার সাথে পেরে ওঠেনি তারা। আমি কৃষককে গিয়ে বলব, এসো ভাই বেগুনের দাম আমি ৪০ টাকা দিলাম? নাকি হাটে আর কোন ক্রেতা নেই দেখে ২৫ টাকায় কিনতে চাইবো? সেখানে অনেক বিক্রেতা, ক্রেতা আমি একা, সেখানে চাষি দাম বেশি পাবে, না কম? শহরের যে ক্রেতা বেগুন ৬০ টাকায় কিনত তাকেই বা আমি ৫০ টাকায় বেচব কেন? আমি ছাড়া তো আর কোনও বিক্রেতা নেই। গ্রামের হাটে আমি একচেটিয়া ক্রেতা, শহরের বাজারে আমি একচেটিয়া বিক্রেতা। কোন দুঃখে সস্তায় বেচব বলুন তো? কনজিউমার সারপ্লাস যত পারি শুষে নেব আমি। একই বেগুনের দু-তিন রকমের দাম ফেলব ক্রেতা বুঝে। কেনা-বেচা দুদিকেই লাভবান হব আমি। এই প্রক্রিয়ায় সেই দু-তিন জন দালালের কী হবে? তারা বেকার হবে, তাই না? বাজারের ছোট-বড় বিক্রেতাদের, মাটিতে চাটাই পেতে বেগুন বিক্রি করা ঐ 'বুড়ি মাসি'র কী হবে? আমার 'আউটলেট'-এ কাজ পাবে? ভ্যানওয়ালা ঠ্যালাওয়ালাদের কী হবে? যারা ফড়েদের মোট বইত? আমি তো এক গাড়িতেই সব বোঝাই করে শহরে নিয়ে আসব। মিথ্যে প্রচারের একটা সীমা আছে!

বলা হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে হিমঘর হবে, এতে ফসল নষ্ট হবে না, চাষিরাও বেশি দাম পাবে। হিমঘর হলে ফসল কম নষ্ট হবে কথাটা সত্যি। সরকার বানাচ্ছে না কেন? পেট্রোপণ্যে লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে পারে বছরের পর বছর, হিমঘর বানাতে টাকা নেই? ওয়ালমার্ট বা রিলায়েন্স ফ্রেস হিমঘর বানালে কৃষকের সুবিধে হবে? সেখানে চাষি তার ফসল জমা রাখবে ভবিষ্যতে বেশি দামে বেচবে বলে? ওয়ালমার্টকে কালিদাস ভাবা ভুল। ডালে বসে সে ডাল কাটবে না। হিমঘর বানাবে 'অভাবী বিক্রির' সময় জলের দরে আলুটা মূলোটা কিনে তার নিজস্ব হিমঘরে জমিয়ে রাখতে— সময় মতো বেশি দামে বেচবে বলে। ওয়ালমার্ট মডেলে বিশ্বের কোথাও চাষি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর উন্নতি হয়নি। বহু উদাহরণ আছে। তা আলোচিতও হচ্ছে ইদানিং। তাই আর পুনরুল্লেখ করা হলো না। আমরা বরং অন্য কয়েকটি কম আলোচিত আশংকার উল্লেখ করব।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সরকারি ঘোষণার কদিনের মাথায় সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো, লজিস্টিক হাব (যা ওয়ালমার্ট মডেলে অপরিহার্য) স্থাপনে কৃষিজমি অধিগ্রহণে বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। কৃষকের পক্ষে নিঃসন্দেহে ভাল খবর নয়।

ভর্তুকি হ্রাসের এই তরজায় সরকার কিন্তু বারবার বলছেন খাদ্যে ভর্তুকি হ্রাস করা হবে না। তথ্য বলছে, গত ক'বছরে খাদ্যে ভর্তুকির পরিমাণ ভালই বাড়িয়েছে সরকার। ভালো কথা, সমস্যা হচ্ছে— সরকার চাইছে খাদ্যসামগ্রী গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলি না করে নগদ অর্থ সরাসরি গরীব পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে। এ যুক্তিতে অনেকেই সায় দিচ্ছেন, কারণ গত কয়েক বছর ধরেই প্রচার করা হচ্ছে— গণবন্টন ব্যবস্থা ভীষণ ত্রুটিপূর্ণ। যত খাদ্যশস্য বরাদ্দ হয় তার সিংহভাগই নাকি চুরি হয় মাঝপথে। সরকার এতদিন কী

করেছে? চুরি আটকায় নি কেন? (এফসিআই গুদামে পচে নষ্ট হওয়ার চেয়ে অবশ্য চুরি যাওয়া ভালো।)। হঠাৎ করে এ দেশটার সবকিছুই খারাপ হয়ে পড়ল! খুচরো ব্যবসায় ফড়েরা অসৎ, গণবণ্টন ব্যবস্থায় কর্মীরা চোর। রাষ্ট্র এতদিন কিছুই করতে পারল না। এবার ওয়ালমার্ট ও তার সঙ্গীরাই ভরসা! খাদ্য ভর্তুকি যদি অর্থমূল্যেই প্রদান হয় তবে এফসিআই ও পিডিএস-এ যুক্ত লক্ষ লক্ষ রেশন দোকানের কী হবে? কেন? ওয়ালমার্ট কিনবে! বিশ্বের সর্ববৃহৎ রিটেল চেইন বিশ্বের সর্ববৃহৎ বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি হবে নামমাত্র মূল্যে। এফসিআই ও পিডিএস বিশ্বের যে কোন খুচরো ব্যবসায়ীর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও লাভদায়ক বিনিয়োগ। পরবর্তী টার্গেট ভারতের ডাক ব্যবস্থা। খুচরো ব্যবসায় সাপ্লাই চেন খুব জরুরি। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে থাকা রেশন দোকান ও ডাকঘরগুলো হয়ে উঠবে এক একটা রিটেল আউটলেট। চাল, চিনি, সার, বীজ, পশুখাদ্য, কাপড়-চোপড়, কীটনাশক সবই মিলবে সেখানে। সবচেয়ে বড় কথা ওয়ালমার্ট তো শুধু বেচবে না সেখানে। অনেক কিছুই কিনবে ভারতের গ্রাম থেকে। এফসিআই গুদাম তখন ওয়ালমার্টদের হিমঘর।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সাথে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের একটা যোগসূত্র অবশ্যই আছে, অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে। এফডিআই-কে ছাড়পত্র দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী কলকাতায় পূর্বাঞ্চলের কৃষিমন্ত্রীদের নিয়ে সভা করেছেন। প্রচার হচ্ছে, দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সূচনা পূর্বভারতেই হবে। ভয়টা এখানেই। আমাদের ধারণা, ওয়ালমার্ট ও তার সঙ্গী ইউরোপীয় বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ীরা ভারতকে করবে তাদের 'ফুড হাব'। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য পৃথিবীর খুব কম অঞ্চলেই পাওয়া যায়। চীন যেমন বহুজাতিকের ইলেকট্রনিক হাব, ভারত হবে ফুড হাব।

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতন ইউরোপীয় গোষ্ঠী তার নাগরিকদের জিন পরিবর্তিত খাদ্যের বদলে উন্নতমানের খাদ্য জোগানের পরিকল্পনা নিয়েছে। সাবেকি কৃষি পদ্ধতিকে উৎসাহ দিতে ও পরিবেশ সবুজ রাখতে কৃষকদের নানা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২০১৩ সালের মধ্যে ইউরোপের খাদ্যশস্যের বাজার উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে অবাধ করার ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ, ভারত ও আফ্রিকা থেকে জৈব পদ্ধতি ও আর্সেনিক-মুক্ত বৃষ্টি-জলে উৎপন্ন রকমারি খাদ্যশস্য, ফলমূল, সবজি ইউরোপের বাজারে সহজে প্রবেশাধিকার পাবে।

ওলন্দাজ (নেদারল্যান্ডস) ও ইংরেজ সাহেবরা অবশ্য অনেকদিন ধরেই নিজেদের পরিবেশ, বিশেষ করে জল, সংরক্ষণে কার্যকর নীতি গ্রহণ করেছে। হিসেব কষে দেখা গেছে, ১৯৯৭-২০০১ সালে নেদারল্যান্ড ও ইংলন্ডে (ইউকে) জল আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা (ওয়াটার ইমপোর্ট ডিপেন্ডেন্স বা WID) ছিল যথাক্রমে ৮২ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ। যার অর্থ, ওলন্দাজ সাহেবরা তাদের মোট জলভাণ্ডারের ৮২ ভাগ খরচ না করে (ইংরেজেদের ক্ষেত্রে ৭০ ভাগ) মজুত করে রেখেছিল স্রেফ জল নিবিড় (Water Intensive) পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। এবার বোঝা গেল নিশ্চয়ই, ওলন্দাজরা তাদের মিষ্টি জলের ব্যবহার ৭১ শতাংশ থেকে কী করে ১১.৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। জল-নিবিড় পণ্য আমদানি মানে কী? উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরুন, এক টন গম উৎপাদনে প্রয়োজন আনুমানিক ১১৬০ কিউবিক মিটার জল। সাহেবরা যদি ভারত থেকে এক টন গম আমদানি করে, তবে তাদের নিজের দেশে ১১৬০ কিউবিক মিটার জল সংরক্ষিত থাকে আর ভারত থেকে সমপরিমাণ অদৃশ্য জল (Virtual water) গমের পিঠে চেপে সেদেশে পাড়ি দেয়!

তবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইউরোপীয় গোষ্ঠী তার নাগরিকদের জিন পরিবর্তিত খাদ্য থেকে আড়াল করলেও ইউরোপীয় বহুজাতিক সংস্থাদের, যেমন Syngenta-র, অন্য দেশে জিন প্রযুক্তি প্রসারে বাধা নেই। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কয়েক হাজার বীজ উৎপাদনকারী এখন সিনজেন্টার ব্যবসায়িক সঙ্গী।

অনুমান করা যায়, দ্বিতীয় কৃষি বিপ্লবের হাত ধরে এদেশে চলবে দু ধরনের চাষ পদ্ধতি।

(ক) দেশীয় বীজে জৈব পদ্ধতিতে চাষ— মূলত দেশের বিত্তবান স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে ও বিদেশে রপ্তানি করতে। খাদ্যের গুণগত মান ঠিক রাখতে আর্সেনিক-দুষ্ট পাতাল-জলের ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে। চাষ করতে হবে পরিশুদ্ধ বৃষ্টির জলে। ওয়ালমার্ট ও তার সঙ্গীরা সেসব বাছাই করা খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করবে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা তাদের আউটলেটগুলিতে।

(খ) জিন পরিবর্তিত বীজে চাষ— মূলত দেশীয় বাজারে স্বল্পদামে আমজনতার মুখে খাদ্য যোগানের তাগিদে। এদেশে এখনও ৩৭ শতাংশ নাগরিক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। আমাদের মতো জনবহুল দেশে তীব্র খাদ্যাভাবে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। তাই নতুন তোড়জোড়। কোটি কোটি হাভাতে মানুষের জন্যে আর্সেনিক-দুষ্ট পাতাল-জলে (আরও বেশি পাতাল-জল তোলার পক্ষে সওয়াল শুরু হয়েছে) জিন পরিবর্তিত বীজে ও বেশি কীটনাশক প্রয়োগে উৎপন্ন হবে Franken Food।

সরকারের দেওয়া ভর্তুকির টাকায় ওয়ালমার্টদের গ্রামীণ ও শহরতলির আউটলেটে সেই বিষ ঢালা খাদ্য কিনতে ছুটবে গরীব চাষি মজুর। সরকারি টাকার সবটা খাদ্যে খরচ হবে না, কিছুটা 'অন্য খরচ' তো হবেই। অপুষ্টি ও শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হয়ত

আরও একটু বাড়বে। কিন্তু খাদ্য রপ্তানি থেকে বিদেশি মুদ্রা তো আসবে! এত বিদেশি ঋণ— শোধ করতে হবে না!!

ড. মনমোহন সিংহ সবই জানেন, বোঝেন। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ কোনটাই যে দেশের 'আমজনতার' মঙ্গল করবে না তা আমার আপনার থেকে কম জানেন না তিনি। তবু বন্দী সিংহের মতো গর্জে যাচ্ছেন বারবার। দুষ্টু লোকে বলছে, সিংহ নাকি বিলুপ্তির পথে, সরকারি প্রকল্প ছাড়া বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হবে হয়ত! আমাদের এক বন্ধু শলা দিয়েছে মশার মত বেঁচে থাকার। ডিডিটি সহ ভয়ঙ্কর সব বিষ তেলেও তাদের কাবু করা যায় নি আজও। বাঘ সিংহের চেয়ে মশা হয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা হয়ত বেশি। কিন্তু মনে হচ্ছে সে সুযোগ আর নেই। সিদ্ধান্ত হয়েছে জিন বদল করে এবার মশার বংশ বৃদ্ধি রুখে দেওয়া হবে।

চার দশক আগে হেনরি কিসিংগার বলেছিলেন, "If you control the oil you control the country, if you control the food you control the the population"। প্রথম দুটি উদ্দেশ্য সফল। জ্বালানি ও খাদ্যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির কব্জায় এখন জিন পরিবর্তিত বন্ধ্যা বীজ (terminator seed)। এরপর কি প্রান্তিক মানুষের পালা? প্রথম সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে নাকি 'সফল' হয়েছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি। এবার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব Eugenics তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাবে না তো? এই ভয়ঙ্কর তত্ত্বের হোতারা কিন্তু অনেকেই সবুজ বিপ্লবের কাণ্ডারী! সাধু সাবধান!

তথ্যসূত্র :

1. Ministry of Petromium & Natural Gas, GOI: Basic Statistics 2010-11
2. GOI: The Expert Group on a Viable and Sustainable System of Pricing of Petrolium Products, 2010.
3. GOI: The Report of Advisory Board on Energy, May 1984
4. The Economic Survey 2011-12
5. animal-feed-india.com
6. Jeen Dreze, Amartya Sen: Putting Growth in Perspective, *Outlook Magazine*, Nov. 14, 2011
7. দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৭.৯.২০১২
8. Depankar Dey, 2009, The Second Green Revolution in India, http://ssrn.com/abstract+1447795

ব্যক্তিগত : পেট্রোপণ্যের মূল্যনির্ধারণের জটিল পদ্ধতি Administrative Pricing Mechanism (APM)-এর প্রথম পাঠ আমি পেয়েছিলাম আমার বাবা, আসাম অয়েল কোং-এর প্রাক্তন কর্মী, শ্রীনলিনীকান্ত দে-র কাছে। লেখাটা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ডাক্তারি স্নাতকোত্তরে ভর্তি নিয়ে গোলমাল

৪ পৃষ্ঠার পর

মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এর পরে আবার ঐ একই প্রার্থীদের একবার ইনসেনটিভ ছাড়া ও আরেকবার ইনসেনটিভ দিয়ে কাউন্সেলিং করা হয়। যদিও সর্বশেষ রায়ে সরকারকে নতুন করে তালিকা তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে এখনই নতুন তালিকা বের করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই।

সরকারের এই অপদার্থতার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে যে ক্ষতি হলো তার একটা তালিকা করা যেতে পারে। প্রথমত, যে চিকিৎসকেরা সত্যি সত্যিই রিমোট/ডিফিকাল্ট এরিয়ায় নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করে চলেছেন, প্রাপ্য সুবিধা থেকে তাঁরাই এ বছর বঞ্চিত হলেন সবথেকে বেশি। দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলিং ও ভর্তির যে প্রক্রিয়া জুলাই মাসে সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা সম্পূর্ণ হলো অক্টোবরে। ফলে প্রায় চার মাস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে ২৭৫টি আসন খালি থাকল। আমাদের রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম ধারণাও আছে তাঁরাই জানেন রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই চারমাস রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলো সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত, এই চারমাস ধরে প্রার্থী চিকিৎসকদের যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার শিকার হতে হলো তার মূল্যও কম নয়। মনে রাখা দরকার, এঁরা স্নাতক স্তরের অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রী নন, এঁদের প্রত্যেকেই চাকুরিরত এবং তাঁদের নিজস্ব সংসার আছে। সবার উপরে রয়েছে উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির প্রভাব যে তাঁদের পারিবারিক ও কর্মজীবনেও পড়েছে, এটা বুঝে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্য সরকার তালিকা প্রকাশ করার আগেই সরকারি চিকিৎসকদের একটি সংগঠন রিমোট/ডিফিকাল্ট এলাকার একটা যুক্তিপূর্ণ তালিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে দিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেটিকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সরকারের এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কি পুরোটাই অপদার্থতাপ্রসূত, না কি তার মধ্যে 'বিশেষ' কিছু চিকিৎসকদের 'বিশেষ' সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নীতি স্বাস্থ্য সমেত সব ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত রয়েছে?

প্রবন্ধ

ভারতে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

বিনায়ক সেন

ভারতের আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে, সাম্প্রতিক কিছু ইতিহাসের, বিশেষত ১৯৪৩-এর বাঙলার দুর্ভিক্ষের প্রতি, দৃষ্টিপাত করলে ভালো হয়। ৩০ লক্ষ মানুষ সেই দুর্ভিক্ষে মারা যান। আমার বয়সী অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালীর মতোই আমি আমার মায়ের কাছে সেই দুর্ভিক্ষের গল্প শুনেছি। শস্যের কোন ঘাটতি ছিলনা। এই বিষয়টার উপরই আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। কারণ প্রত্যেকেই দুর্ভিক্ষ বলতে বোঝেন খাদ্যাভাব, বিশেষ করে শস্য ঘাটতি। ১৯৪৩-এ বাংলায় শস্যের কোন অভাব ছিল না, যেমন এখন ভারতে কোন শস্যাভাব নেই। বাস্তবত, শস্য এতটাই অতিরিক্ত যে সরকারের পক্ষে তা সংরক্ষণ করাটাই সমস্যা, পাছে পচে যায়। অমর্ত্য সেন ঐ দুর্ভিক্ষের অর্থনীতির বিখ্যাত বিশ্লেষণ করেছেন— "বিনিময় প্রাপ্যতার ব্যর্থতা" (the failure of exchange entitlements)। অন্য কথায়, সামাজিক যে ব্যবস্থাপনা, সাধারণ মানুষকে খাদ্য যোগানের জন্য চালু ছিল, তা ভেঙ্গে পড়েছিল।

সম্প্রতি তরুণ ঐতিহাসিক মধুশ্রী মুখার্জি এই বিশ্লেষণকে আরও বিস্তারিত করেছেন। তাঁর 'চার্চিলের গোপন যুদ্ধ' বইতে তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ সমেত দেখিয়েছেন, বর্ণবিদ্বেষী উইনস্টন চার্চিল, যুদ্ধের সময়ে বাংলার চাল ব্রিটিশ সৈনিকদের খোরাক হিসাবে যাতে ব্যবহার করা যায় তা নিশ্চিত করতে, চাল বাজেয়াপ্ত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার গমও তিনি একই ভাবে সরিয়ে রেখেছিলেন। অবশেষে, বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে, জাপ-দখলিকৃত মায়নামার থেকে মেদিনীপুর অভিমুখে জাপানীদের অভিযান বানচাল করতে, মেদিনীপুরে পোড়ামাটি নীতি ঘোষণা করে তিনি সমস্ত ফসল ধ্বংস করেছিলেন এবং নদীপথে শস্য পাচার রুখতে সমস্ত নৌকা পুড়িয়ে ফেলে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

সব কিছুই ঘটেছিল ১৯৪৩ সালে, মিঃ চার্চিলের আদেশে। ৩০ লক্ষ বাঙালি কৃষকের জীবনের থেকে সৈন্যদের প্রয়োজনটাকে বড়ো করে দেখা হয়েছিল। যেটা আমি বলতে চাই, দুর্ভিক্ষ, এবং আরো বিস্তারিত ভাবে বললে আমাদের দেশে ও বিশ্ব জুড়ে ঘটমান প্রধান মানবিক অধিকার লঙঘনের ঘটনাগুলি, নিজস্ব কোন কারণে ঘটে না। ধনী ও শক্তিমানদের সুবিধা দেওয়ার নীতির ফলশ্রুতিতেই, অর্থাৎ গরীব ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের ক্ষতি ক'রে সেসব ঘটে ।

গত কুড়ি বছর ধরে, সাধারণভাবে, আমরা এমন এক রাজত্বে বাস করছি, যেখানে বিশেষ করে সংবিধানের 'নির্দেশক নীতিসমূহে' উল্লেখিত অর্থনৈতিক সুবিচার ও সমতার প্রশ্নটিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ধনীর আরও শ্রীবৃদ্ধি ও দরিদ্রের ক্রমশ নিঃস্ব হওয়াকে অর্থনীতির উন্নতির লক্ষণ এবং প্রগতির পথ মনে করা হচ্ছে। এর বিশেষ লাগসই উদাহরণ হলো, ১৪ ডিসেম্বর (২০১১) ক্যাবিনেট মিটিঙে খাদ্য নিরাপত্তা বিল প্রসঙ্গে শ্রী শারদ পাওয়ারের উক্তি। শোনা গেছে তিনি বলেছেন, "দেশের প্রত্যেক লোককে আমরা খাওয়াব কী করে? দুর্ভিক্ষ হলে প্রত্যেকের খাদ্য যোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" বোকাবোকা কথার এ এক নিদর্শন, অন্যত্র ৩২ টাকা আর ২৬ টাকা নিয়ে যা শুনেছি, তার মতোই।

নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে আসার আগে, দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমি আর একটি সাধারণ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শ্রী সেনের 'প্রাপ্যতা বিনিময়ের' দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অমৃতা রঙ্গস্বামীর (ইপিডব্লিউ, অক্টোবর ১৯৮৫) সমালোচনা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, "হঠাৎ করে অনাহারে পতিত হওয়া, যা দুর্ভিক্ষের অবস্থা হিসাবে চিহ্নিত, আসলে দুর্ভিক্ষের অন্তিম অবস্থা, যখন অনাহারের সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে, দুর্দশাগ্রস্তরা মারা যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ শুধুমাত্র দুর্দশাগ্রস্তদের মৃত্যু-ঘটিত কোন ঘটনা নয়। দুর্ভিক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার মূল কারণ হলো রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যে নির্ধারকগুলি এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে, সেগুলি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা। সেইজন্য আমাদের দুর্ভিক্ষের পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন; রাজনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক যে বিষয়গুলি ব্যাপক জনসমষ্টিকে চাপে রাখতে ক্রিয়াশীল থাকে, সেগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন।"

অনেকেই দুর্ভিক্ষকে সর্বনাশা হিসাবে চিত্রিত করেন। সন্দেহ নেই, অনাহারের লক্ষণগুলি উন্মোচিত হলে, তা জয়নাল আবেদিনের ছবি বা বিয়াফ্রার ফোটোগুলির মতো, আমাদের জীবনভর তাড়না করে। । কিন্তু এ সবই দৈনন্দিন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, দুর্ভিক্ষের তাৎপর্য হিসাবে যা বুঝতে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

বিশ্বাসযোগ্য এবং যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক নৃতাত্ত্বিক (anthropometric) সমীক্ষা করা মুশকিল এবং তাই তা পাওয়া মুশকিল। সম্প্রতি নন্দী ফাউন্ডেশন শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা সম্পর্কে এক মূল্যায়ন করেছে। তাতে দেখা গেছে, অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসরের শিশুদের ৪৪ শতাংশ অপুষ্টির শিকার।

রিপোর্টটি প্রকাশ করার সময়ে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, এটা আমাদের "জাতীয় লজ্জা"। এ বিষয়ে সংশয়

নেই, কিন্তু এই লজ্জা আমাদের পরিচিত। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশনের একটি অংশ ন্যাশনাল নিউট্রিশন মনিটরিং ব্যুরো (এনএনএমবি) অনেক বছর ধরে একই ধরনের তথ্য দিয়ে আসছে এবং তারাও ২০০৫-০৬ সালের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৩-এর (NFHS-III) পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৩ ইতিমধ্যে বলেই দিয়েছিল, অনূর্ধ্ব-পাঁচ বৎসরের শিশুমৃত্যুর অর্ধেকই অপুষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সিআইএ-র ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক অনুসারে ভারতের শিশুমৃত্যুর হার (IMR) ৪৬— তা বিশ্বে চতুর্দশ সর্বোচ্চ এবং বাংলাদেশ ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের আইএমআর ৪৯। সিআইএ যখন বলছে, কথাটা সত্যিই হবে। বিশ্বের প্রেক্ষিতে, প্রতি তিন সেকেন্ডে একজন শিশু, কোথাও না কোথাও, পরিহারযোগ্য অপুষ্টির কারণে মারা যাচ্ছে। ঐ তিন সেকেন্ডে বিশ্বের অস্ত্র কারখানাগুলি এই ব্যবস্থাকে নিরাপদ রাখার জন্য ১ লাখ ২০ হাজার ডলার ব্যয় করছে।

এতক্ষণ আমরা শিশু অপুষ্টির কথাই বলছি। যখনই অপুষ্টি নিয়ে আলোচনা হয়, সবাই ভাবে শুধুমাত্র শিশু-অপুষ্টি নিয়েই বলা হচ্ছে। এর একটা কারণ হলো, বয়স্কদের পুষ্টি সম্পর্কিত সংবেদনশীল ও নির্ভরযোগ্য মানবদেহের মাপজোপ ব্যবহার হচ্ছে কুড়ি বছরেরও কম সময়। এখন যেটি প্রায়শ ব্যবহৃত হয়, সেই দৈহিক ভরের সূচক (Body Mass Index or BMI), গোষ্ঠীগত এবং ব্যক্তিগত, উভয় স্তরেই বেশ মানোপযোগী।

বিএমআই শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, এটি কেবলমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ওজনের কিলোগ্রাম পরিমাপকে উচ্চতার মিটার পরিমাপের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে বিএমআই পাওয়া যায়। বিএমআই-এর সংকট-মান (critical value) ১৮.৫। এই মানের থেকে কম মানের অর্থ দীর্ঘকালীন খাদ্যাভাব বা বুভুক্ষা। মানটি ১৮.৫ থেকে ২২ পর্যন্ত থাকলে তা স্বাভাবিক, আর ২২ (অথবা ২৩)-এর বেশি মান অতিরিক্ত ওজন (over-weight) ও মেদবাহুল্য (obesity) নির্দেশ করে। পুনার পেডনেকার সংখ্যাতাত্ত্বিক (epidemiological)[১] সমীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, বিএমআই-এর মান ১৮.৫-এর যত নীচে যায়, মৃত্যুহার ততই বাড়তে থাকে। ১৮.৫-এর উপরের মৃত্যুহারকে যদি ১ ধরা হয়, তাহলে ১৮.৫ থেকে ১৭-এর মধ্যে মৃত্যুহার হয় ১.৩৩, ১৭ থেকে ১৬-এর মধ্যে হয় ১.৫। বিএমআই ১৬-এর নীচে নেমে গেলে মৃত্যুহার দাঁড়ায় ১৮.৫-এর উপরের 'স্বাভাবিক' মৃত্যুহারের দ্বিগুণ। হু-এর সুপারিশ— কোন গোষ্ঠীর ৪০ শতাংশের বিএমআই ১৮.৫-এর কম হলে, সেই গোষ্ঠীকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ধরতে হবে।

ভারতে বয়স্ক মানুষের অপুষ্টির অবস্থাটা কী রকম? ... ২০০৯ সালে প্রকাশিত আদিবাসী অধ্যুষিত 'ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট এজেন্সি'[২] এলাকায় ন্যাশনাল নিউট্রিশন মনিটরিং ব্যুরো-র সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, সেখানে ৪০ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯ শতাংশ মহিলার বিএমআই ১৮.৫-এর কম। এর অর্থ, এই এলাকাকে দীর্ঘকালীন বুভুক্ষা-পীড়িত এবং ফলত দুর্ভিক্ষগ্রস্থ ধরা উচিত। সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলে এবং ফলত মোটামুটিভাবে সারা দেশে, বিএমআই ১৮.৫-এর কম এমন মানুষের সংখ্যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ এবং মহিলাদের ৩৬ শতাংশ, পুরুষ-নারী মিলিয়ে ৩৫ শতাংশ। ঐ সমীক্ষা আরও দেখায় যে, তপশীল উপজাতির ৪১.৯ শতাংশ এবং তপশীল জাতির ৩৮.৪ শতাংশ মানুষের বিএমআই ১৮.৫-এর কম। সংখ্যালঘুদের জন্য গঠিত সাচার কমিটিও দেখিয়েছে, সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের বিএমআই ১৮.৫-এর কম। অন্য ভাবে বললে, ভারতের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ ধারাবাহিক খাদ্যাভাবে ভুগছে, এবং এই পরিস্থিতি হয় দুর্ভিক্ষাবস্থার উপযুক্ত, নয়ত তার একেবারে কাছাকাছি। এই দুভিক্ষ কোনো বিশেষ সময়ের নয়— ভারতের বিশাল সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে স্থায়ী দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে।

এনএনএমবি সমীক্ষা এটাও দেখিয়েছে যে, পুরুষদের ৫৫ শতাংশ এবং মহিলাদের ৭০ শতাংশ রক্তাল্পতায় পীড়িত, এবং তাদের খাদ্যে ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি ও প্রোটিন প্রভৃতি যে যে খাদ্যগুণ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তার প্রত্যেকটিরই ঘাটতি দেখা গেছে।

এটাই সব নয়। জেএনইউ-এর বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ উৎসা পটনায়েক দেখিয়েছেন, ১৯৯৪ থেকে ২০০৪— এই দশ বছরে খাদ্যশস্য গ্রহণে ক্রমাবনতি ঘটেছে। সুতরাং কেবল ধারাবাহিক খাদ্য-ঘাটতি আছে তাই নয়, এই ঘাটতি ক্রমবর্ধমান। ২০০৯-১০ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষাও এর সাক্ষ্য দেয়।

যক্ষ্মার সংখ্যাতাত্ত্বিক (এপিডেমিওলজিক্যাল) তথ্য এর থেকেও বেশি শিহরণ উদ্রেককারী। বিলাসপুরে 'জন স্বাস্থ্য সহযোগে' কর্মরত আমার সহকর্মীরা যক্ষ্মার প্রায় এক হাজার পরীক্ষা-লব্ধ নমুনা থেকে প্রমাণ করেছেন, বিএমআই ১৮.৫-এর নিচে থাকার সঙ্গে ফুসফুসের যক্ষ্মার সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য। জেএনইউ-এর ডঃ রাজীব দাশগুপ্ত, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ কমিউনিটি মেডিসিন পত্রিকায় দেখিয়েছেন, ফুসফুসের যক্ষ্মায় মৃত্যু ১০ বছরে পাঁচগুণ বেড়ে গেছে।

দুর্ভিক্ষের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলি দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগে,

১। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখা— মানুষের মধ্যে রোগের আবির্ভাব, বিস্তার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চর্চা

২। যে সমস্ত অঞ্চলে তপশীল উপজাতি মানুষের সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি, এইরকম চিহ্নিত ১৯৪টি অঞ্চল

দুর্ভিক্ষের এখনকার অবস্থার এই হলো ছবি। লক্ষ্য করা দরকার, এরকম এক অবস্থা আর ক্ষমতাবানদের গুদামে মজুত পর্যাপ্ত খাদ্য সহাবস্থান করতে পারে, এবং করছেও। আক্রান্ত যারা, তারা টিকে থাকতে পারছে একমাত্র জল, জমি, অরণ্য ইত্যাদি সর্বসাধারণের সম্পদে ব্যবহারের সুযোগের কারণে, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান ও তা কাজে লাগাবার কারণে।

কিন্তু এমিনেন্ট ডোমেইন বা সার্বভৌম অধিকারের ছত্রছায়ায় ভারতীয় রাষ্ট্র এই সমস্ত সম্পদের এক প্রকার লুণ্ঠনের জামিনদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত সম্পদ ভারতীয় এবং বহুজাতিক লগ্নি পুঁজির করতলগত করা হয়েছে। এটা করার জন্য রাষ্ট্র তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত— যখন সম্ভব তখন অস্ত্র ছাড়া, আর প্রয়োজন হলে সশস্ত্র পথে। 'নন্দিনী সুন্দর' (নন্দিনী সুন্দর বনাম ছত্রিশগড় সরকার— অনুবাদক) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য— ধনীদের জন্য কর ছাড় আর গরীবের জন্য বন্দুক, এই হচ্ছে ভবিষ্যতের কল্পচিত্র।

জটিল এই পরিস্থিতির মধ্যে কিছুটা সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে পিইউসিএল বনাম ভারত সরকার ''খাদ্যের অধিকার'' মামলা। বিগত দশ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি অনুকূল পথেই এগোচ্ছে। এই মামলায় আদালতের ঘোষিত বিভিন্ন আদেশের ফলেই এ দেশের গণ-বণ্টন ব্যবস্থার বর্তমান রূপটি আকার পেয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলো—

১) দারিদ্রসীমার নীচে প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৩৫ কেজি শস্য বরাদ্দ;

২) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য দুপুরের খাবার;

৩) অনূর্ধ্ব-পাঁচ বৎসরের শিশুদের পরিপূরক খাদ্য;

৪) সন্তানসম্ভবা ও স্তন্যদায়ী মহিলাদের পরিপূরক খাদ্য

খাদ্যের অধিকার মামলা গণ-বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দিলেও, বুভুক্ষার যে ব্যাপ্তি ও তার নানা অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম সেগুলি দেখিয়ে দেয় যে এই সব সুবিধাগুলি অপর্যাপ্ত এবং অসমঞ্জস। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মতো দেশের সবথেকে 'সমৃদ্ধ' এলাকাতেও প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও অপুষ্টির ঘটনা ঘটছে। তাছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা বিল সম্পর্কে শারদ পাওয়ার মহাশয়ের সতর্কবাণী আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। বিলটি আইনে পরিণত হলে তা খাদ্য নিরাপত্তার দিকে অগ্রসর হওয়ার বদলে আমাদের কয়েক কদম পিছনে ঠেলে দেবে। যে বর্গীকরণ বর্তমান গণ-বণ্টন ব্যবস্থাকে জটিল করে তুলেছে, আইন চালু হলে তা অনেক জটিলতর হবে এবং অপব্যবহারের প্রবণতা বাড়বে। মাথাপিছু শস্যপ্রাপ্তি বেশ কমে যাবে; তার উপর, শস্য বণ্টন ব্যবস্থা হয়ত নগদ অর্থ প্রদান দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে।

আমি দেখিয়েছি, অনাহারের নির্দিষ্ট সব লক্ষণ, পুষ্টিগত অসামর্থ্য, বর্তমান এমন এক রাজত্বে যেখানে শস্য-প্রাচুর্য বর্তমান, যার নাম সবুজ বিপ্লব। এই তথাকথিত বিপ্লব হলো কৃত্রিম সার, কীটনাশক, জল ইত্যাদি ভর্তুকিপ্রাপ্ত বাহ্যিক শক্তির প্রয়োগ এবং চাষের যন্ত্র, পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফল— অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চাল ও গমের ফলনের জন্য।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে, স্বল্প ব্যয়ের দেশীয় স্থিতিশীল কৃষির ঐতিহ্য, আমাদের জোয়ার-বাজরা অর্থনীতি, আমাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কৌশল, আমাদের মাটি— সব কিছুই ধ্বংস হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ জল শুধুমাত্র নিঃশেষই হয়নি, তাতে ব্যাপকভাবে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ ঘটিয়েছে। কৃষি ও অরণ্য-ভূমির বিশাল অংশ শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভিন্নমুখী করা হচ্ছে— যেমন তামাক ও ইথানল উৎপাদন, ইওরোপ ও আমেরিকার গবাদি পশুর জন্য সয়াবীন উৎপাদন, আখ উৎপাদন। অথবা, ভূমিকম্প-প্রবণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৫২টি বিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, যেখানে আমরা ওঙ্কারেশ্বর ও ইন্দিরা সাগর বাঁধের ক্ষেত্রে দেখেছি, বাস্তুহারা মানুষের জন্য কোন পুনর্বাসন ব্যবস্থা নেই।

তেলের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলা আজকের এই যুগে এমন সময় আসছে, যখন ভর্তুকি দিয়ে এইরকম বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ আর হয়তো সম্ভবই হবে না, মুনাফার কথা ছেড়েই দিলাম। ততদিন পর্যন্ত যদি আমরা আমাদের মাটি, আমাদের জল অর্থনীতি, আমাদের বীজ ব্যবস্থা, সুস্থ থাকার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং সমবণ্টনের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে না পারি, দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে তখন লক্ষণগুলি ভয়ানক ভাবে ফুটে উঠবে।

তাহলে, কী করতে হবে? স্বল্পমেয়াদী কাজ হলো, খাদ্য নিরাপত্তা বিল পরিবর্তন করতে হবে। শারদ পাওয়ারের আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রত্যেকে যাতে যথেষ্ট খাদ্য পেতে পারে— শুধু দানাশস্য বা কেবল চাল-গম নয়, ডাল ও তেল-সহ খাদ্য, যাতে সকলেই ভালোভাবে খেতে পারে, অনাহারের লক্ষণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী কাজ হলো, আখ, তামাক, এ্যালকোহল অথবা সয়াবীনের মতো অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর কৃষির বিরুদ্ধে গণ-প্রচার গড়ে তোলা দরকার। আমাদের খাদ্য উৎপাদনের দেশীয় ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। যেমন, জোয়ার-বাজরা, ডাল, সবুজ সব্জি এবং পরিপূরক হিসাবে প্রাণীজ প্রোটিন। খাদ্য সংরক্ষণ ও বণ্টনের গোষ্ঠী-ভিত্তিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের এমন এক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে খাদ্যের ক্ষেত্রে সমতা বিরাজ করে, শান্তিপূর্ণ ভাবে একসাথে বসবাস করা যায়।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে নয়াদিল্লীতে প্রদত্ত এ এন দাশ স্মারক বক্তৃতা

প্রবন্ধ

অসম: স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মাঝখানে

সঞ্জয় হাজারিকা

অসমের মনোহর রূপ, সবুজের সমারোহ, রাস্তার দুধারে ধানখেত, ছুটে চলা নদী, এখন হিংসা আর সন্দেহ, ভীতি আর ঘৃণায় বিদীর্ণ। সব গোষ্ঠীর মানুষই সন্দিহান। গত কয়েক সপ্তাহ, মাস ধরে পশ্চিম অসমের গ্রামগুলিতে শয়ে শয়ে মানুষ, ছেলে-বুড়ো, সারারাত জেগে থেকেছে। জুলাই মাস থেকে পশ্চিম অসমের গ্রামগুলোতে আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, যাতে মূলত বরো গোষ্ঠীর মানুষরা ও বাঙালি মুসলমানেরা যুক্ত থেকেছে। তবে অন্য গোষ্ঠীর লোকেরাও গন্ডগোলের পরোক্ষ শিকার হয়েছেন।

এঁরা দুই গোষ্ঠীর কোন একটির সদস্য, নিজেদের গ্রাম রক্ষার চেষ্টা করছেন, কোনো কোনো জায়গায় তো যৌথ নজরদারি চলে— যার থেকে বোঝা যায় যে সব কিছু এখনো ভেঙ্গে পড়ে নি, সব কিছু হারিয়ে যায় নি।

কিন্তু, রাতপাহারা প্রমাণ করে যে মানুষ সরকারের ওপর, প্রশাসনের ওপর, কতটা আস্থা হারিয়েছে। ওরা যখন সারারাত জেগে থাকে, জেগে থাকে ভয়, মশা, বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে, তখন অন্যরা বাড়ির বারান্দায় বা গেটের কাছে ঘুমোয়। সবাই সবসময় সন্ত্রস্ত। লোকেরা ক্লান্ত, ভীত, ক্রুদ্ধ। একটুখানি ফিসফাস বা একটি ফোনই হিংসা ডেকে আনতে পারে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি-অবনতি ঘটতে থাকে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রাণ শিবিরে বাস করে— দেশবিভাগের পরবর্তীকালে দেশের মধ্যে বৃহত্তম উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে একে। ঘটনা হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল অঞ্চল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যেখানে অন্তত ২২০টি জাতি-গোষ্ঠী বাস করে— ভারতের সীমানার মাত্র ৪ শতাংশের অধিকারী আটটি রাজ্য জুড়ে সেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যা আর হিংসার ফলে বাস্তুহারা হয়েছে সম্ভবত ভারতের অন্য সব অংশের চেয়ে বেশি।

বরো ইত্যাদিদের হোমল্যান্ড নির্দিষ্ট ও পুনর্নির্দিষ্ট করা হয়েছে বারংবার। যারা এতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (অবশ্য গণতান্ত্রিক বলে বর্ণিত এই প্রক্রিয়া কতটা সবাইকে নিয়ে চলে? বিরাট বিরাট গোষ্ঠী যদি এর বাইরে থেকে যায় তাহলে কি সেই প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক বলা যায়?) থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করেছে তারা আবার একে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। যারা এই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তারা আবার ভীতি ও ক্রোধের চাপে পড়ছে, তাদের 'অপর' বলে ছাপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সমস্যার খলনায়ক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

এতে করে, কাজের জন্য যাদের বাইরে যেতে হয়, তারা তাদের কর্মস্থলে সহজ বোধ করছে না। সারা দেশ থেকে, বিশেষত দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ ফিরে আসার সময় এটা বোঝা গেছে— ইদের সময় প্রতি-আক্রমণের ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা। এটা লক্ষণীয় যে, দেশের অন্যান্য অংশ থেকে যারা ফিরে এসেছিলেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে অসমে যারা রাতপাহারা দিচ্ছে তাদের মতোই তাঁরাও বিপদের মুখে। দু জায়গাতেই সরকার বা প্রশাসন নিয়ে বিশ্বাসের অভাব একই রকম।

কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার কথা নিয়ে যত আলাপ আলোচনা চলছে, পাশাপাশি তার কতগুণ লোক যে গুজবে কান না দিয়ে থেকে গেছেন, তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বা এমনকি সিভিল সোসাইটিতেও তেমন আলোচনা নেই। যারা ব্যাঙ্গালোর বা অন্য কোনো শহর ছেড়ে গেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বপ্ন সফল করতে তাদের সেখানে ফিরতে সাহায্য করতে হবে।

নাম করা সব লেখক, জোরদার রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত ব্যক্তি, অ্যাক্টিভিস্ট ও সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় দুটো কথার ওপর বারবার জোর পড়ে। বাংলাদেশি উদ্বাস্তু আর বেআইনি অভিবাসী। এই হিংসাকেও দেখানো হচ্ছে বরো-মুসলিম হিংসা হিসাবে। প্রায় কেউই এটা বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি যে বরো, মুসলিম, এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর, রাজনীতিবিদ, যুব, ছাত্র, পণ্ডিত ব্যক্তি ও সিভিল সোসাইটি ও গ্রাম-নেতাদের মধ্যেকার মডারেটদের একটা কণ্ঠস্বরও আছে, যদিও সংবাদমাধ্যমের চেঁচামেচিতে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়।

অসম ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে সমস্যাটা আরও বড়ো মাত্রায় রয়েছে) বেআইনি অভিবাসনের সমস্যাটা একটা বাস্তব সমস্যা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'বরো টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্টার্ড' জেলাগুলোতে সমস্যা আরো জটিল হয়েছে, কারণ সেখানে জমি, বিশেষত কৃষি জমি ও জঙ্গলের সামান্য সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতার ফলে অনেক জটিল ইস্যু তৈরি হয়েছে। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন খাতে যে টাকা রয়েছে, তার ভাগের প্রশ্ন আছে।

অ-বরো গোষ্ঠীগুলির অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, সংখ্যায় বেশি হলেও তারা তাদের প্রাপ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র পায়। এদের মধ্যে আছে মুসলিম, আদিবাসী (উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকে ব্রিটিশরা চা-বাগানের জন্য যাদের বর্তমান ঝাড়খন্ড থেকে নিয়ে এসেছিল তাদের উত্তরাধিকারীরা), কোচ-রাজবংশী, অসমীয়া ও বাঙালি হিন্দুরা। আদিবাসী এবং কোচ-রাজবংশীরাও তপসিলি

উপজাতির অভিধা চায়, কিন্তু বরোদের তাতে তীব্র আপত্তি, কারণ তাতে জনবিভাজনের ওপর আরও চাপ পড়বে, রাজনৈতিক ভারসাম্যও ব্যাহত হবে। মনে রাখতে হবে, ক্ষমতা এখন বরোদের হাতে।

সমস্যা আরো তীব্র হলো এই কারণে যে, বরো এলাকায় কোনো গোষ্ঠীরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। বরোরা জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ, মুসলিমরা মোটামুটি ২০ শতাংশ, কোচ-রাজবংশী ও আদিবাসীরা উভয়েই ১৫ শতাংশ করে, বাকি ১০ শতাংশ নানান গোষ্ঠীর মানুষ।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জমি কী ভাবে ভাগ হবে, প্রতিটি গোষ্ঠীর অধিকার কতটা— বেআইনি দখলদারদের (বেআইনি দখলদার বলতে ১৯৭১ সালের পর থেকে আসা অজানা সংখ্যার মানুষেরা) কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল? এটাই সংকটের আসল কারণ। কোনো একটিমাত্র নয়, সব গোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। নাকি, কোনো একটি গোষ্ঠীর হাতে অস্ত্র আছে বলে, বা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও যোগাযোগ আছে বলে, অন্য গোষ্ঠীরা তাদের দয়ায় থাকতে রাজি হয়ে যাবে?

অভিবাসনের কথা বলে এসব মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় না, তবে এটা দুই পক্ষের দক্ষিণপন্থীদের হাতে দারুন অস্ত্র। বিজেপি এ থেকে যতটা সম্ভব ফায়দা ওঠানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে— অসম, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ফলত সারা ভারতের ক্ষেত্রে যার নানান ফল ফলতে পারে এমন একটি ইসু পেয়ে তারা সেটাকে ব্যবহার করে চলেছে, সারা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে তারা পূর্ব ভারতের অবস্থা "বোঝানোর" জন্য মিটিং-মিছিল করছে, সেমিনার করছে।

অভিবাসনের বিষয়টি সবচেয়ে তুঙ্গে উঠেছিল ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকের অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিদেশি-বিরোধী আন্দোলনের সময়। রাজীব গান্ধীর হাতে ১৯৮৫ সালের অসম চুক্তিতে তার সমাপ্তি ঘটে। তখন ১৯৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে যারা এসেছেন সাময়িকভাবে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, অভিবাসীদের চিহ্নিতকরণ ও ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। এ নিয়ে কাজ অবশ্য বিশেষ এগোয় নি। বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অসঙ্গতি বের করে, আর সুপ্রিম কোর্টের এক আইনে এটিকে অসাংবিধান ঘোষণা করা হয়।

অসম চুক্তি ছিল একটি অর্থনৈতিক প্যাকেজের অংশ। সেই প্যাকেজের অনেক কিছুই আজ ২৭ বছর পরও পাওয়া যায় নি। ঐ চুক্তিতে কর্মসংস্থান তৈরির কথা বলা হয়েছিল, শিল্প গড়ার কথা বলা হয়েছিল। সে সময়ে, বিশেষ করে ১৯৮৩-র দাঙ্গার সময় যে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন হয় তাতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে অন্তত ৩০০০ মানুষ প্রাণ হারান।

উদয়ন মিশ্র দেখিয়েছেন যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সবসময়ই বহিরাগতদের প্রতি একটা সন্দেহের মনোভাব বর্তমান ছিল। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যারা ওখানে বসবাস শুরু করেন তাদের বলা হতো নোয়া-অসমীয় বা নয়া-অসমীয়া, কারণ তারা অসমীয় ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা করে নেন, সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর সময় অনেকে অসমীয় পদবীও নেন।

আসামের মুসলিমদের সম্পর্কে একটা মৌলিক সত্য কেউ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন না। মুসলিমরা আজ অসমের এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার মুসলিমদের অংশের বিচারে অসম দেশের মধ্যে দ্বিতীয়— জম্মু ও কাশ্মীরের পরেই। মুসলিমরা প্রথম দফায় আসে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে। এদের বলে খিলোনজিয়া। এঁরা অসমীয় ভাষায় কথা বলেন। এঁরা সাধারণভাবে উদারমনস্ক, অন্যদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। অসমের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতিদের এঁদের অবদান অনেক। এঁরা মুসলিমদের ২০ শতাংশ। বাকিরা এসেছিলেন দ্বিতীয় ঢেউয়ে, বিংশ শতকে— ১৯৪৭-এর আগে ও পরে। একধাক্কায় নয়, বারে বারে। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সাহিত্য রচনা করেছেন, কাব্য রচনা করেন, রাজনীতিবিদ তৈরি করেছেন। এদের শেষ অংশটা এসেছেন বাংলাদেশ থেকে, বেআইনিভাবে।

এখানেই যুক্তি ও অযুক্তির বিরোধ বাধে। পরস্পরবিরোধী হিসাবের মধ্যেও বিরোধ বাধে। জাতীয় নাগরিক রেজিস্টার নতুন করে না করলে এই বিবাদের মীমাংসা হবে না— কে আইনি আর কে নয়, তার সমাধান হবে না। এই প্রক্রিয়া গত বছর শুরু হয়েছিল, তারপর অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের তরফে তার বিরোধিতার ফলে পুলিশের গুলি চলে, অনেকজন প্রতিবাদীর মৃত্যু ঘটে। এ ছাড়া আছে মুসলিম র‍্যাডিকালরা সহ দুদিকের গোঁড়া দক্ষিণপন্থী শক্তি, যারা এই প্রক্রিয়ার বিরোধী।

এই বিষয়টির সমাধান বরো এলাকায় এবং ভারতের অন্যত্র বসবাসকারী মুসলিমদের কাজে লাগবে সন্দেহ নেই। এমনকি বরো নেতৃত্বও বলেছেন যে তাঁরা ভারতীয় মুসলিমদের অধিকার রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে ক্ষেত্রে, কংগ্রেস থেকে বদরুদ্দিন আজমলের অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট— যারা এইসব সমস্যার কিছু কিছু শুরু করার জন্য দায়ী বলে বলা হয়, বরো পিপলস ফ্রন্ট, ভারতীয় জনতা পার্টি, অসম গণ পরিষদ, অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, অল অসম মাইনরিটিস ইউনিয়ন ও এরকম সব গোষ্ঠী— সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মধ্যে একটা চুক্তি হোক যে তারা এই এনসিআর রিভিশন হলে তা মেনে নেবে।

এমনকি বিভিন্ন দলের মাথায় যদি ২০১৪ সালের সাধারণ

নির্বাচনের কথা থাকে তাহলেও এনসিআর প্রক্রিয়া শুরু করাটাই তাদের স্বার্থে কাজ করবে। এধরনের এক ঐকমত্য গঠন করা খুব কঠিন হলেও, এনসিআর-এর কাজ শুরুর আগে সেই ঐকমত্য তৈরি করতে হবে; তা না হলে আবার তা ব্যর্থ হবে। এখানেই কেন্দ্রকে একটি সৎ মধ্যবর্তিতার কাজটি করতে হবে। অথবা অভিবাসন নিয়ে কাজ করেছেন, অসম ও সাধারণভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা জানেন-বোঝেন এবং সব গোষ্ঠীর তাদের ওপর বিশ্বাস আছে, এমন সব প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে তাকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।

অন্যথায়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর বারবার আক্রমণের ফলে এক ভীতিপ্রদ অবস্থা সৃষ্টি হবে— যেকথা অনেকেই বলছেন। ন্যাশনাল কমিশন অফ মাইনরিটিস সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে কোনো কোনো জঙ্গি ব্যক্তি অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারে— এই অঞ্চলের অনেক গোষ্ঠীর কাছ থেকেই অস্ত্র পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে নতুন এক ফ্রন্ট তৈরি হবে, যা ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর দুঃস্বপ্নের কারণ হবে।

আর একটা চ্যালেঞ্জও আছে। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার। অন্তত ৫০০ বেআইনি অটোমেটিক অস্ত্র ঘুরছে ওখানে। এর বেশিরভাগটাই প্রাক্তন বরোল্যান্ড টাইগার ফোর্সের (তাদের নতুন নাম হলো বরোল্যান্ড পিপলস পার্টি, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে) ও ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট অফ বরোল্যান্ডের (যাদের চেয়ারম্যান রঞ্জন দাইমারি এখন জেলে) ক্যাডারদের হাতে। আরও জটিলতা আছে। ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট অফ বরোল্যান্ডের একটা আলোচনাপন্থী অংশ আছে, একটা আলোচনা-বিরোধী অংশ আছে। এছাড়া আছে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা এগুলোর কোনোটার সঙ্গেই নেই। এদের নিরস্ত্র করার কাজে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের ক্ষমতার পরীক্ষা হবে। আর, এই নিরস্ত্রীকরণ না করলে এই এলাকাগুলিতে সুরক্ষাও ফিরবে, আস্থাও ফিরবে না।

বর্তমান অবস্থা খুবই দুশ্চিন্তার, বিশেষত যদি এর ফলে হারানো আয়, হারানো ঘর ও হারানো আশার হিসাব নেওয়া হয়। শিবিরে আশ্রয় নেওয়া এবং তার বাইরে তটস্থ হয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা বিপন্ন। এসব অঞ্চলে দারিদ্র্য একটি রূঢ় বাস্তব। শিবিরগুলিতে বসবাসকারীদের অনেকেই কোনমতে বেঁচে থাকা মানুষ। আসাম ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সবসময়েই কম— ৩ থেকে ৫ শতাংশ— রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও। মৃত্যু ও ধ্বংস এখানে নিয়মিত হানা দেয়, এছাড়া আছে বন্যা, যা মানুষের ওপর তাণ্ডব চালায়।

একথা মনে রাখলে ভালো হয় যে ১৯৯০-এর দশক থেকে আজ, এই প্রবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত ১.২ লক্ষ মানুষ, সাঁওতাল, বরো, আদিবাসী ও মুসলিম, ত্রাণশিবিরে বাস করেছেন। তাঁরা সেখানে বাস করেছেন, মারা গেছেন, অসুস্থ হয়েছেন, জন্ম নিয়েছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের অস্থায়ী বাসস্থানই তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য ত্রাণসাহায্য-র ওপর নির্ভর করে তাঁদের বেঁচে থাকা।

আর একটা বিষয় নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। এই অবস্থায় মানুষের ওপর যে চাপ যে আঘাত থাকে তার ওপর কাজ করা। ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি অন হেলথ বলেছেন সমস্যাসংকুল এলাকাগুলিতে কাউন্সেলিং ও ট্রমা সেন্টার খুলতে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা নারী ও শিশুদের। ঘৃণা, আঘাত ও ভীতি কাটানোর জন্য প্রথম কাজ শুরু করতে হবে বিটিএডি এলাকায়, নইলে এত বেশি ক্রোধ ও নেতিবাচক মানসিকতা পরের প্রজন্মেও চালান হবে। দ্বন্দ্বের ইতিহাস এরকমই। এক প্রজন্মের আঘাত বারংবার বলার মধ্য দিয়ে পরের প্রজন্মে চলে আসে।

প্রতিদিনকার রোজগার নেই, ফসল নেই, ফসল বোনায় বাধা পড়েছে। জীবনচক্রে দারুণ আঘাত নেমেছে। দুর্ভাগ্যজনক বাস্তব এই যে যারা সবচেয়ে অসহায়, দুর্বল ও গরিব, তাদের ওপরই আঘাত নামে। তারা পালাতে বাধ্য হয়, ঘটনার শিকার হয়— বার বার, বছরের পর বছর। অনেকেই যদিও নিজের ঘরে ফিরতে চায়, ত্রাণশিবির ও সাহায্য নিয়ে বাঁচার লজ্জা থেকে বাঁচতে চায়, তারা ফিরতে ভয় পায়, কারণ তাদের ভয় দেখানো হয়, ভয় দেখায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি, আবার ক্ষমতাসীনরাও। যদি তারা বেশিদিন ঘরের বাইরে থাকে, তাদের ঘর অন্যের হয়ে যাবে, তাদের গৃহস্থালি জিনিসপত্র, তাদের জমির কাগজ— সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ১০০ শতাংশ ভারতীয় হলেও তখন তারা কীভাবে তাদের পরিচয় প্রমাণ করবে?

এই প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে, তাহলে যারা পরে এসেছে, তারা ভারতীয় হলেও যাদের নামে প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গেছে, তারা উৎখাত হবে, উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে। এই অবস্থা যাতে হিংসা ও প্রতিহিংসার বৃত্তের জন্ম না দেয়, জঙ্গিপনা দেখা না দেয়, যার ফলে করে দুর্বল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত আরও অরক্ষিত হয়ে পড়ে, তাহলে বেআইনি অস্ত্র হাতে যারা কাজ করে, যাদের কোনো শাস্তি হয় না, আইনের প্রক্রিয়া যাদের ছুঁতে পারে না, তাদের মোকাবিলা করতে হবে। সুরক্ষাবাহিনী ও পুলিশকে ব্যবহার করতে হবে।

এর মধ্যে, অসমে যখন বেআইনি অভিবাসীদের নিয়ে বিতর্ক চলছে, রাজ্যের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্‌ধ বা আন্দোলন বা মিটিং চলছে, বাংলাদেশীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ক্রুদ্ধ দাবি শোনা যাচ্ছে। অথচ, গত ৩০ বছর ধরে, আসু ও তারপর এএজিএসপি-র বিদেশি বিরোধী আন্দোলনের পর

এখনও সে রাজ্যে কত বাংলাদেশী আছে বা তারা কোথায় আছে তার কোনো সর্বগ্রাহ্য ধারণা নেই।

উদাহরণস্বরূপ, কোকরাঝাড়ে ও বিটিএডি জেলাগুলিতে, যেখানে বিদেশিদের আগমন খুব বেশি বলে রাজনীতিবিদরা, সংবাদমাধ্যম ও আন্দোলনকারীরা দাবি করে, সেখানে গত জনগণনায় দেখা যাচ্ছে দশক প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে কম। এর ব্যাখ্যা কী হবে? এর মানে এই নয় যে বিদেশি আগমন ঘটেনি, কিন্তু হয়তো অনেকটা আসা-যাওয়াই ঘটেছে জেলাগুলির মধ্যে, অঞ্চলগুলির মধ্যে।

আসু ও অন্য সংগঠনগুলি এটা ঠিকই বলে যে ১৯৭১ সালের পর যারা দেশের বাইরে থেকে এসেছে তাদের ফেরত পাঠানো উচিত। এটাই আইনগত অবস্থান। কিন্তু ভারত সরকার ও অসমের ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যসরকারগুলির কি তা করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে? এত বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ করতে হলে পুলিশ ও আইন কার্যকর করার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে, যেমন রেভিনিউ বিভাগের কর্মীদের, বড় হারে ব্যবহার করতে হবে। তার ফলে গত জুলাই-আগস্টে আমরা যেমনটা দেখলাম, গত বছরগুলিতে যেমন দেখেছি, তার চেয়েও বেশি হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। যারা বিদেশি বিতাড়নের কথা বলেন তারা কি এটা বোঝেন না যে কোনো সরকারই— কংগ্রেস, এনডিএ, ইউপিএ, এজিপি, বিজেপি— যে সরকারের কথাই বলুন না কেন কেউই এরকম একটি গোষ্ঠীকে টার্গেট করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চায় না।

অসমের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও আগেকার অভিজ্ঞতা এর পরিষ্কার প্রমাণ। আর একটা মৌলিক প্রশ্ন আছে। এই কাজ করার ক্ষমতা কি অসমের আছে? চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়নের দাবি করা খুব সোজা। কিন্তু সেটা করার মতো পুলিশবাহিনী কি আছে? পুলিশে সব সময় লোকাভাব। কেউ কেউ বলতে পারেন, রাজ্য সরকার যাতে এই সমস্যাটা থেকে উৎরোতে পারে তা দেখা ভারত সরকারের দায়িত্ব। সেটা কী ভাবে করা যাবে? বিশেষ বাহিনী পাঠানো হবে? তা করা হলে, কোন্ সাংবিধানিক ও আইনি ভিত্তিতে তা করা হবে? এগুলি খুব জটিল প্রশ্ন, আর এগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগোনো যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে, এ নিয়ে যত ভাববো, তত আমরা অতীতে ঘুরপাক খাব। আর সেটাই ভয়ানক বিপদের কথা। যে অতীত এত জীবন নিয়েছে, একটি প্রজন্মকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে— অনেক ছাত্র ও বৃত্তিজীবী তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে নি, বৃত্তি নিয়ে কাজ করতে অপারগ হয়েছে— আমরা কি সেই অতীতের ভুলের, অতীতের ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি করে চলবো? মাইগ্রেশন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আর একটি সমস্যা উঠে আসে (যা আবার উত্তপ্ত বিতর্ক বা ক্রুদ্ধ আলোচনার জন্ম দেয়)। লোকে প্রায়ই আইনি অভিবাসী (দেশের মধ্যেকার) ও বেআইনি অভিবাসীদের (যারা আন্তর্জাতিক সীমান্তর ওপর থেকে আসে, কোনো আইনি কাগজপত্র ছাড়াই, আর কাগজপত্র নিয়ে এলেও তার সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও থেকে যায়, ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বা বিশাল শহরাঞ্চলে উধাও হয়ে যায়) মধ্যে বিভাজন করে থাকেন।

প্রথম ক্ষেত্রে, ভারতের নাগরিকদের এদেশের যে কোনও জায়গায় বসবাসের অধিকার আছে— জম্মু ও কাশ্মীর আর ষষ্ঠ তফশিলিতে সংরক্ষিত জায়গাগুলি ছাড়া। দেশের কোনো অঞ্চলে বসবাসের ক্ষেত্রে এদের, ভারতীয় নাগরিকদের, ধর্ম, ভাষা বা অন্য কোনো বিষয় প্রাসঙ্গিক নয়। একইভাবে, বেআইনি বলতে বোঝাবে ভারতের নাগরিকত্ব না থাকা।

হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকাটা দশকের পর দশক ধরে চলেছে। তাতে করে অবশ্য যে মূল সমস্যাটা থেকে সরে আসা যায় না। দশকের পর দশক ধরে অসমের মানুষ বিশ্বাস করে এসেছেন যে বাংলাদেশ থেকে আসা বেআইনি মাইগ্রেশন এমন একটা বিষয় যা কেবল এই রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকেই অন্ধকার করে দিচ্ছে তাই নয়, এটা একটা অস্তিত্বের সংকটের বিষয়। কিন্তু যারা ১৯৭১ পূর্ববর্তী সময় নিয়ে বিতর্ক তুলতে চান তাদের মনে করাতে চাইবো যে বিতর্কের সেই অংশটি ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫ সালের অসম চুক্তি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার, অসম রাজ্য ও আসু সই করেছিল, তাতে এর সমাধান করে দেওয়া হয়েছিল। যারা ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে এসেছেন, যাদের নিয়ে আসু-র আপত্তি ছিল, সে সমস্যারও সমাধান করা হয় তাদের পরবর্তী কালে ভোটদানের অধিকার দিয়ে। অন্যান্য বিষয়, যেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, যেমন অসমের মানুষের অধিকার রক্ষা (কারা অসমীয়া তা নিয়ে ঐকমত্যের অভাবে এটি ২৫ বছর ধরে আটকে আছে)— এগুলিও নির্ণীত হয়েছে।

কিন্তু ১৯৮০-র দশক আর ২০১২ সাল এক নয়। এটাও ভাবা দরকার যে আমরা বিগত সময়ে কীসের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। সেসব যেন আমরা ভুলে না যাই। তরুণ সাংবাদিক হিসাবে কত যে ট্রাজেডি আমরা দেখেছি তা ভাবতে গেলে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলি, জায়গার হিসাব হারিয়ে ফেলি— ছেগাঁও, গোহপুর, সিরিং সাপোরি, গোসাইগাঁও, সিলাপাথার, নেলি— হিসেব বেড়েই চলে।

আরও আছে। এক সংকট থেকে আর এক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছি আমরা। পুড়িয়ে দেওয়া এক গ্রাম থেকে পুড়িয়ে দেওয়া আর এক গ্রামে। কবরস্থান, মৃতদেহের স্তূপ, ত্রাণশিবিরে মরিয়া মানুষ। আজ এক নতুন ও আগ্রাসী প্রজন্মের সাংবাদিকরা এসেছে। তাদের স্মার্ট ফোন আর স্মার্ট প্রযুক্তি দিয়ে তারা রিপোর্ট করে চলে যেন তারা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে না, সম্পাদকীয়

লিখছে বা নীতির বিষয়ে বলছে। যা একেবারে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয় তাকে ভুলে গেলে চলবে না। যে ঘটনার অনেক দিক, অনেক স্তর, তাকে একস্তরীয় করে দেখালে চলবে না।

ক্রোধ, সন্দেহ আর ভীতির ঢাক পেটানো চলছে আবার। নতুন রূপে সেই পুরনো মদ। ভয়ানক ভীতি আর ঘৃণা আমাদের চিন্তাভাবনা কেড়ে যাতে না নেয় তার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নইলে আরও একটা ট্র্যাজেডি ঘটে যাবে।

একটা ঘটনা নিয়ে শুরু করা যাক। সবাই যে ঘটনার কথা সংবাদমাধ্যমে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার হিসেবে ১৯৮৩ সালের গণ-হত্যাকাণ্ডের পরই আমি নেলি গিয়েছিলাম। সেখানে অন্য সাংবাদিকদের পেছনে ফেলে আমি অল্প সময়ের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করার: তিনি কি এর নৈতিক দায়িত্ব নিচ্ছেন (তিনি বলেছিলেন, তিনি এর দায়িত্ব চাপাচ্ছেন আন্দোলনকারীদের ওপর), কতজন মারা গেছে (তিনি বলেন যে সংখ্যাটা অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা হচ্ছে)। এর পরই তিনি ঝড়ের মতো বেরিয়ে যান। পুলিশি বাধায় আর প্রশ্ন করা যায়নি।

কিন্তু এখানে দুটি কথা মনে করা যাক। প্রথমত, ২০১৩ সালে নেলি হত্যাকাণ্ডের ৪০ বছর পূর্ণ হবে। আমার সন্দেহ আছে, নিহতদের মধ্যে আদৌ কেউ বাংলাদেশী ছিল কিনা। থাকলে অবশ্য সেই হত্যাকাণ্ডটিকে কম নিষ্ঠুর বলা যেত না। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য একজনকেও শাস্তি দেওয়া হয়নি। (যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁরা জানিয়েছিলেন যে ঐ জনতার মধ্যে কিছু কিছু লোককে তাঁরা চিনতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাঁদের শ্রেণীরই লোক, প্রতিবেশী, তাদের সাথেই তাঁরা বেড়ে উঠেছেন। এর থেকে প্রশ্ন উঠে আসে— সাধারণ মানুষকে কীভাবে খুনি বানানো হয়!) এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, ২০০২ সালে গুজরাটের মুসলিম বিরোধী হত্যাকাণ্ডের তুলনা করে দেখুন। সম্প্রতি একটি আদালতে কয়েকজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যতই ভয়ানক ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন, এর ফলে হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা তাঁদের পরিবারের কাছে একটা অর্থে ঘটনাগুলির একরকম পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু নেলি বা ১৯৮০-র দশকের অন্য ট্র্যাজেডিগুলোর ক্ষেত্রে তা হয়নি। আমরা কি একই রক্তমাংসে তৈরি নই? এক ধরনের ন্যায়বিচার না হলে কি শান্তি ও সুরক্ষার বাতাবরণ তৈরি হতে পারে?

যারা অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলে তাদের বলা হয়— এখন এসব কথা বলছেন কেন? এখন তো অতীত নিয়ে ভাবার সময় নয়, সবার ভালোর জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। কিন্তু এজন্যই তো অস্বস্তিকর সত্যগুলিকে সামনে আনার দরকার, বার বার, যাতে করে অতীতের ক্ষতি ভুলে না যাই, আবার তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

অনেকে সীমান্ত সিল করার কথা বলেন। যারা এই কথাটি সবচেয়ে বেশি বলেন তারা হয় কখনো সীমান্তে যান নি, বিশেষত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মতো কঠিন সীমান্তে, অথবা তারা জানেন না যে সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া অসম্ভব। এসব হলো চটকদার কথা, বলা সহজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করতে পারে নি। জার্মানি, ফ্রান্স বা ব্রিটেন পারে নি। আমার জানা কোনো দেশই পারে নি।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে ২০০০ কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত। এর মধ্যে মাত্র ২৭২ কিলোমিটার অসমে। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত এর চেয়ে বড়, কিন্তু সেখানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে এত সোরগোল নেই। আমাদের কি মনে হয় যে সব অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের রাজ্যেই প্রবেশ করতে লাইন দিয়েছে, তারা ঐ ২৭২ কিলোমিটার সীমান্তের ৩-৪ মিটার উঁচু কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে বিএসএফ-কে এড়িয়ে এ রাজ্যে ঢুকে পড়ছে— বিএসএফ-এর অবশ্য অকেজো বলে ও আরও নানা বদনাম আছে।

ফেলানি বাংলাদেশের একটি মেয়ে। বয়স ১৫। গত বছর, জানুয়ারির ঠান্ডায়, সে ও তার বাবা ঐ কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করে— তার বিয়ের কথা ছিল। বিএসএফ তাকে গুলি করে। নামানোর আগে তার দেহটা পাঁচ ঘন্টা ধরে ঝুলে থেকেছে। তার প্রাণহীন দেহের ছবি বাংলাদেশে ও সারা বিশ্বে সোরগোল তুলেছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও ভারতে অনেকের কাছে সে 'বেআইনি অনুপ্রবেশের' এক দৃষ্টান্ত। ঢাকার কাছে সে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক দৃষ্টান্ত। অন্য এক দেশের সেনাবাহিনীর লোকের হাতে এক নিরীহ ব্যক্তির হত্যা। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে, কোন্ জিনিসকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেবো সেটা আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমাদের এটা বোঝা উচিত। ফেলানি হত্যা নিয়ে সোরগোলের ফলে বিএসএফ আগে গুলি চালিয়ে পরে প্রশ্ন করার অভ্যাস বন্ধ করেছে। কিন্তু তথ্য অন্য কথা বলে। ২০০৬ সাল থেকে কাঁটাতারের বেড়া পেরোতে গিয়ে ৪০০ জন বাংলাদেশী প্রাণ হারিয়েছেন। একই কারণে এর অর্ধেক সংখ্যক ভারতীয়ও গুলি খেয়েছেন। আমাদের কাছে বেআইনি অনুপ্রবেশ জপমন্ত্র হতে পারে। বাংলাদেশের কাছে জপমন্ত্র হলো জল (পড়ুন তিস্তা, ফরাক্কা, টিপাইমুখ), কাজ ও জীবিকা। আমি এখানে আরো একটি বিষয় যোগ করবো, যে দিকে কেউ নজর দেয় না— এ বিষয়টি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, সাংবিধানিকতার ও আইনের প্রশ্ন তোলে।

সেটা হলো ২০-২৫ জুলাই বরো ও দখলকারী মুসলিমদের মধ্যেকার রক্তাক্ত সংঘর্ষ মোকাবিলায় সামরিক বাহিনী ডাকতে দেরি করার বিষয়টি। এই দেরির ফলে মৃত্যু অনেক বেড়েছে, এবং দেশভাগের পরবর্তীকালে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাস্তুহারাকরণের ঘটনা ঘটেছে।

সামরিক বাহিনী আনার ক্ষেত্রে দেরি হয়েছিল পদ্ধতিগত বাধার কারণে। কিন্তু ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর দেশব্যাপী যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটা মান্য ব্যবস্থা (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়র) তৈরি করেছে যাতে সাম্প্রদায়িক (এর মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত সমস্যাও পড়ে) গন্ডগোলের জন্য সামরিক বাহিনী ডাকলে মন্ত্রক সেটিকে বিবেচনা করে দেখে কীভাবে তা করা হবে, কখন কাজে নামা হবে। আইন মন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা হয়।

বরিষ্ঠ এক সামরিক অফিসার বলেন যে এইরকম নিয়মের উদ্দেশ্য হলো "রাজ্য সরকারগুলো যাতে হুট বলতেই সেনাবাহিনী ডাকতে না পারে"। এজন্যই অসমে যা ঘটেছে সেটা ফিরে দেখা দরকার:

অসমে ইতিমধ্যেই সোনাবাহিনী মোতায়েন ছিল, রাজ্যটিকে বা তার অংশবিশেষকে 'উপদ্রুত' ঘোষণা করার মাধ্যমে। যার ফলে দরকার বুঝলে মারাত্মক ধরনের বলপ্রয়োগের অধিকার ছিল সেনাবাহিনীর, আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টের (AFSPA) অধীনে যতটা সম্ভব ততটাই। অন্যভাবে বললে, এই সমস্ত অধিকার ছিল সেনাবাহিনীর— ঘিরে ফেলে তল্লাসি, অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস, সন্দেহের বশে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার, ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ঢুকে তল্লাসি, এবং এমনকি সন্দেহের বশে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে গুলিচালনা। রাজ্যে বিদ্রোহের অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও রাষ্ট্রবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীদের কাজকর্মের মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনী থেকে গেছে। প্রায়ই খবর পাওয়া যায় যে তারা অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে, এমনকি 'এনকাউন্টার' ঘটেছে— অসমে বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য কোথাও। উল্লেখযোগ্য যে, AFSPA-র কোথাও, কোথাও-ই বলা হয় নি যে সেনাবাহিনীর এসব কাজকর্ম সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরুদ্ধেই হতে হবে, যদিও ধরে নেওয়া হয় যে তাই হবে। আইনে শুধু বলা আছে যে সেনাবাহিনী অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে। যেসব রাজ্য বা ইউনিয়ন টেরিটরিতে AFSPA বলবৎ আছে সেখানকার রাজ্যপাল বা প্রশাসক যদি মনে করেন যে সেই রাজ্য বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের পুরোটা বা কোনো একটা অংশ এমন সমস্যাসংকুল বা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যে অসামরিক প্রশানের সামরিক বাহিনীর সাহায্য দরকার, সেই রাজ্যের রাজ্যপাল বা কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ রাজ্যটিকে বা তার অংশবিশেষকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করেন। অর্থাৎ দাঙ্গা দমনে অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করতে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করা যায়। আর তার সিদ্ধান্ত নেয় সেনাবাহিনী নয়, সরকার। সরকারের হয়ে রাজ্যপাল, যিনি মন্ত্রীসভার উপদেশ মানতে বাধ্য। কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার, কিংবা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রশাসক।

অসমের চীফ সেক্রেটারির একটি আবেদন, আর তারও আগে কোকরাঝারের (সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যে জেলার) ডেপুটি কমিশনার, এবং তার পর ধুবড়ি জেলার ডেপুটি কমিশনার সেনাবাহিনীর স্থানীয় কম্যান্ডারের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। এ বিষয়টিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। যদিও সেনাবাহিনীর বেশ কিছু শাখা অসমে বা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি প্রস্তুত অবস্থাতে উপস্থিত ছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে প্রথম সংবাদ পৌঁছায় ২০ জুলাই আর সেনা নিয়োগের অনুমতি মেলে ২৫ জুলাই। এই দেরি করার ফলে, একদিকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে গোষ্ঠীগুলি যখন আক্রমণ চালাচ্ছে আর বিপরীতে বিরাট জনতা যেখানে সুযোগ বুঝছে সেখানেই বর্শা ও দা হাতে আক্রমণ করছে— এরকম ভয়ানক গন্ডগোল আরও পাঁচদিন ধরে চলতে পারল। দুপক্ষেরই ঘর জ্বালানো হয়েছে। টাকাপয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের পাশাপাশি জমি ও সম্পদের দলিলগুলিও আগুনে নষ্ট হয়েছে। রাজ্য সরকার সাহায্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও পাঁচদিন ধরে অসম জ্বললো।

এমন আইন রয়েছে যা স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের ওপরে। স্ট্যান্ডার্ড অপারেডিং প্রসিডিওর তো প্রশাসনিক একটি প্রক্রিয়া মাত্র। ভারতের অপরাধ আইনের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১৩০ ও ১৩১ নং ধারায় প্রাসঙ্গিক অংশে তা বলা আছে। এতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে অসামরিক প্রশাসন সাহায্য চাইলে সেনাবাহিনী দ্রুত তাতে সাড়া দেবে। অবস্থা কখন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এর মোকাবিলা করতে পারে কিনা, সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন আছে কিনা সেটা অসামরিক প্রশাসনই নির্ধারণ করতে পারে। দেশের আইন ও সংবিধান তাই বলে, এটা AFSPA-র ওপরে, AFSPA তো রাতের জন্তু, ১৯৫৮ সালে তা তৈরি হয়েছিল, (কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নাম না করেই) , তার আংশিক কারণ এই যে এই আইনটি সারা দেশ জুড়ে ব্যবহার করা হয়, এটি AFSPA-র চেয়ে অনেক পুরনো, অনেক গ্রহণযোগ্য। অনেকেই AFSPA-র বিরোধী।

সামরিক বাহিনী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, অন্তত স্বীকার করেছে যে সামরিক বাহিনী নামাতে দেরি হয়েছে। এজন্য তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে ঐ পদ্ধতিটি বন্ধ করে দিতে বলেছে। কিন্তু তারা পদ্ধতিগত দেরির আড়ালে আত্মগোপন করতে পারে না। এর দায়িত্ব কাউকে নিতে হবে। কে সামরিক বাহিনী নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করিয়েছে, এবং কেন? এর উত্তর মানুষকে জানাতে হবে, এ বিষয়ে তদন্ত করাটা জরুরি। কোনো অঞ্চলে যদি অস্ত্র আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভীতিপ্রদর্শন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয় তাহলে সেখানে স্বাভাবিকত্ব ফিরতে পারে না।

(অনুবাদ আমাদের)

প্রবন্ধ

নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলন : আমাদের দেশ

সৌম্য দত্ত

জইতাপুর জ্বলছে

সারা পৃথিবীর মানুষ নতুন করে নিউক্লিয়ার চুল্লি তৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলার জইতাপুর-এর মানুষ ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের সম্রাটদের বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছর ধরে সংগ্রাম করছেন। পশ্চিমের কোঙ্কন অঞ্চলের যে তিনটি জেলাতে সবুজ-ছাওয়া পাহাড়, অগুনতি সমুদ্র খাঁড়ি এবং নদী-র সঙ্গে রয়েছে সরেস বনাঞ্চল এবং জীববৈচিত্র্য, রত্নাগিরি জেলা সেই তিনটির একটি। এই অঞ্চলটাই বিখ্যাত আলফান্‌সো আমের এক উৎপাদন ক্ষেত্র। পাশাপাশি রয়েছে অনেক কাজু বাদাম-এর বাগিচা। অঞ্চলটিতে অনেকগুলি মৎসবন্দরও রয়েছে। প্রকৃতিমাতা কোঙ্কন অঞ্চলকে যেন দু'হাতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

শক্তি উৎপাদনে উন্মত্ত ভারতের নিউক্লিয়ার সংস্থা এমনই এক সুরলোকে অসুর রূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নিউক্লিয়ার শক্তি উদ্যোগ নির্মাণের প্রস্তাব করেছে। ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তির উদ্‌গাতারা এরেভা সংস্থার নক্সার ভিত্তিতে ১৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার ছয়টি ইউরোপিয়ান প্রেসারাইড-ওয়াটার রিঐ্যাক্টর বা ইপিআর বসানোর পরিকল্পনা করছেন। চুল্লি বসানোর জন্য ভারত সরকার বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ করেছেন, মানুষের প্রতিবাদ নির্মমভাবে দমন করেছেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে দু জন প্রতিবাদী মানুষ পুলিশের নির্মম আক্রমণে শহিদ হয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কোঙ্কন বিনাশকারী প্রকল্প বিরোধী সংঘর্ষ মোর্চা এবং কোঙ্কন বাঁচাও সমিতি সহ আরও বহু সামাজিক সংগঠন এই সংগ্রামে যোগদান করছেন। এঁদের সঙ্গে সারা ভারতের নিরিখে ক্ষুদ্র হলেও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ একদল মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, ভারত দেশটি উন্মত্ত-র মতো নিউক্লিয়ার মরুভূমির দিকে দ্রুত ধাবমান হচ্ছে। পৃথিবী এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো জইতাপুর নিউক্লিয়ার চুল্লিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলছেন, সর্বনাশা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। সেই সব প্রশ্ন, সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার বদলে সরকার পুলিশি নিপীড়ন, বহিষ্কারের আদেশ-এর মতো দমনমূলক পদক্ষেপের পাশাপাশি মিথ্যা এবং অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির পথও গ্রহণ করছে।

এই অঞ্চলে কাজু এবং আম-এর মতো উচ্চ মূল্যের বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আগেই সেচখাতে অনেক অর্থ লগ্নি করা হয়েছে। এই অঞ্চলের পাহাড়ি সমুদ্র বেলাভূমি ও সমুদ্র খাঁড়ির ফলে বিভিন্ন জাতের মাছের যোগান প্রচুর। মাছের লভ্যতার কারণে এই অঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসীর জীবিকা ছিল সুনিশ্চিত। জইতাপুরে নিউক্লিয়ার চুল্লি উদ্যানটি স্থাপন করার প্রস্তাবটি এই সব কিছুকেই এক বড় প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে যে কারণে স্থানীয় মানুষেরা উদ্বিগ্ন বোধ করছেন তা হলো—

- প্রস্তাবিত এই নিউক্লিয়ার চুল্লি-উদ্যান থেকে নিম্নস্তরের যে তেজস্ক্রিয়তা সবদিকে ছড়াতে থাকবে, তার প্রভাবে আলফানসো আম দূষিত হয়ে পড়বে। এই আম-এর যে বৃহৎ রপ্তানি বাজারটি রয়েছে, তা এই দূষণের ফলে কমে আসবে বলে আশঙ্কা করার কারণ রয়েছে।
- মৎস্যজীবীদের বড় গ্রাম সানক্রি নাটে থেকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য যে দু'টি খাঁড়ি সমুদ্রকে গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, প্রস্তাবিত এই নিউক্লিয়ার চুল্লি-উদ্যানটি সেই দুটি খাঁড়িকে রুদ্ধ করে দেবে। ফলে এই বড় গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের জীবিকা করানোর সংগত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।
- অন্যান্য যে কোনো নিউক্লিয়ার চুল্লির মতো জইতাপুরেও নিউক্লিয়ার চুল্লি থেকে গরম জল এবং নিম্নমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমুদ্রে মিশবে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে জলের তাপমাত্রা বাড়বে এবং তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়িয়ে পড়বে। এই দুই ধরনের দূষণের সম্মিলিত কারণে মৎস্যজীবীরা আশঙ্কা করছেন যে এই অঞ্চলে মাছের লভ্যতা কমবে এবং তাঁদের জীবিকায় টান পড়বে।
- ইপিআর নিউক্লিয়ার চুল্লির নক্সা নিয়েই গুরুতর সব প্রশ্ন রয়েছে। এই নক্সার চুল্লির একটাও এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও চালু অবস্থায় নেই। এমন দুটো চুল্লি নির্মিত হতে চলেছে— একটা ফিনল্যান্ড-এর ওলকিলুয়োটো-তে আর অন্যটি ফ্রান্স-এর ফ্ল্যামানভিলে-তে। এই দুটি স্থানেই চুল্লির সুরক্ষাকে ঘিরে ২০০০টি গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেছে। এই সমস্ত প্রশ্ন তুলেছে ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন দেশের নিউক্লিয়ার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। দুটি চুল্লিই তাদের পূর্বঘোষিত চালু হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থেকে বহুদূর পেছিয়ে রয়েছে। খরচও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমবর্ধমান। এই জাতের দুটি চুল্লি চীনে বসানোর কথা ছিল; সেগুলিও এসব প্রযুক্তিগত প্রশ্নের কারণে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে খরচসাপেক্ষ হয়ে পড়ায় আপাতত স্থগিদ অবস্থায় রয়েছে। এই সব কিছুকে আমল না দিয়ে, এমনকি এরেভা-র মতো যে ফরাসি বহুজাতিক সংস্থাটির চুল্লি হল এই ইপিসার, সেই ফরাসি দেশের নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিতে না পারার মতো বিষয় সামনে থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার এরেভা-কে এই নিউক্লিয়ার চুল্লি উদ্যান স্থাপনের জন্য বিপুল পরিমাণে জমি নিয়েছে। যে ফরাসী দেশকে নিউক্লিয়ার শক্তির স্বর্গ বলা হয়, সেই দেশেই যখন এই চুল্লি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তখন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সুরক্ষার বিষয়টি জলাঞ্জলি

দিয়ে এরেভা সংস্থার এই অপ্রমাণিত, অপরীক্ষিত সমস্যা-সংকুল চুল্লি আমদানির সিদ্ধান্ত স্থানীয় মানুষ সহ সারা ভারতের মানুষের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করেছে।

● এরেভার সঙ্গে ভারত সরকারের 'চুক্তি'-র বিষয়টি গোপনীয়তার ঘেরাটোপে ঢাকা। এই চুল্লির দাম কত পড়বে, মোট খরচ কত হবে, এই সব বিষয় তো বটেই, চুক্তির অন্যান্য অংশও এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এরেভা বরাত পেয়েছে কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই, কেননা দরপত্র আহ্বানই করা হয়নি। জমি সহ পুরো প্রকল্পটি এরেভা-র হাতে স্রেফ সমর্পণ করা হয়েছে।

● ফিনল্যান্ড-এর ওলকিলুয়োটো চুল্লির হিসাব থেকে আমরা জইতাপুর প্রকল্পের অর্থব্যয়ের একটা হিসেব কষতে পারি। ফিনল্যান্ডে এই চুল্লির খরচ এখনই ৭০০ কোটি ইউরো (প্রায় ৫৬০০০ কোটি টাকা) ছাড়িয়েছে। এই দামে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পিছু খরচ পড়ছে ২২ কোটি ইউরো। এই মূল্য এমনকী বর্তমানে যে দামে ফোটো-ভোল্টাইক সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসানো হয় তার চেয়েও বেশি। আর সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পে, মনে রাখতে হবে, কোনো বিধ্বংসী দুর্ঘটনা বা তেজস্ক্রিয়তার সংকট নেই—বরং এই উৎপাদন কেন্দ্রের 'জ্বালানি' বিনা পয়সায় আজীবন সূর্য থেকেই পাওয়া যায়। বায়ু শক্তি থেকে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের যা খরচ, এরেভা নিউক্লিয়ার চুল্লি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ তা তিনগুণ। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে রত্নাগিরির অনেক অঞ্চলই বায়ুশক্তি উৎপাদনের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্থান।

গণ আন্দোলন

জইতাপুর নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র এবং তীব্রতা অর্জন করেছে। প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল স্বশাসিতভাবে— কোনো রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে যখন আন্দোলন ভয়াবহ ও তীব্র রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়, তখন বাধ্য হয়ে স্থানীয় মানুষরা রাজনৈতিক দলকে তাঁদের সংগ্রামে সাহায্য করার আবেদন রাখার সিদ্ধান্ত নেন। শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল শিবসেনাকে (যদিও তাদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের অনেকেই অবহিত ছিলেন) আহ্বান জানিয়ে বলা হয় যে যদি এই দল ভোট চায় তো তারা যেন এই আন্দোলনে যোগ দেয়। রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে আন্দোলন অস্থায়ী কিছু সুবিধা পেলেও আন্দোলনের নিজস্ব দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মিল না হওয়াও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ক্রমশ কমতে থাকে। জইতাপুর আন্দোলনের এই অভিজ্ঞতাকে জইতাপুর সংগ্রামী মানুষ অন্যান্য সমস্ত শক্তিরও আত্মস্থ করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে আন্দোলনের মধ্যবর্তী স্তরে ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিয়েও গণ-আন্দোলন বিরুদ্ধতাকে আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে সচেষ্ট, কেননা সরকার প্রস্তাবিত এলাকাকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলছে এবং কিছু কিছু নির্মাণ কাজও শুরু করে দিয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে আমরা আবার আন্দোলনের শিখা উজ্জ্বল করব, সংগ্রামের পুনরুজ্জীবন ঘটাবো।

গোরাখপুর চুল্লি : দিল্লির দ্বারপ্রান্তে নিউক্লিয়ার উন্মত্ততা

নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন-এর স্থান নির্বাচন বিষয়ক একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বা সাইট সিলেকশন কমিটি ২০১০-এর গোড়ায় দিল্লির দ্বারপ্রান্তে হরিয়ানা রাজ্যের ফরিদাবাদ জেলার গোরাখপুর, কুমারিয়া এবং কাজলহেরি গ্রাম তিনটিতে সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত এখানে চারটি ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনক্ষম 'দেশীয়' নিউক্লিয়ার চুল্লি বসানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। এগুলি উচ্চ চাপের ভারী জলের নিউক্লিয়ার চুল্লি বা প্রেসারাইজ হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর, পিএইচডব্লুআর। প্রথম পর্যায়ে এমন দুটি নিউক্লিয়ার চুল্লির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমে এই প্রকল্পের প্রস্তাবিত নাম ছিল 'কুমারিয়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট', কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে এই প্রকল্পের জন্য জমির সিংহভাগই গোরাখপুর গ্রামে পড়ছে, তখন প্রজক্টের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় গোরাখপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। দিল্লি থেকে হরিয়ানার এই গোরাখপুরের সড়ক পথে দূরত্ব প্রায় ২১০ কিমি— যদিও ম্যাপে দেখলে গ্রামটি দিল্লি থেকে ১৫০ কিমি অবস্থিত। এই গ্রামেই ধর্মীয় গুরু বাবা গোরাখনাথ ধ্যানে বসেছিলেন। তাঁর মন্দির আজও অগণিত ভক্ত-অনুগামীকে আকর্ষণ করে। অপূর্ব সুন্দর বিশনই-অধ্যুষিত কাজলহেরি গ্রামের কিছু জমিও প্রস্তাবিত প্রজক্টের আওতায় পড়বে। জেলা সদর ফতেহাবাদ শহরটি হরিয়ানার বৃহৎ শিল্প শহর হিসার থেকে ৪০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে। ফতেহাবাদ শহরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। চতুর্দশ শতকে সম্রাট মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাঁর পুত্র, ফতে খান-এর নামে ফতেহাবাদ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৭ সালে এই শহর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলকে একটি নতুন জেলা বলে ঘোষণা করা হয়। বিকাশশীল অর্থনীতির কারণে এই জেলাটি বর্ধিষ্ণু। এই অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র তিন-ফসলী, ঐশ্বর্যশালী কৃষি-সম্প্রদায়ের আর্থিক লেনদেনের ফলে এই অঞ্চলে অর্থনীতি খুব চাঙ্গা।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ১৫০০ একরের বেশি জমি অধিগৃহীত হতে চলেছে। যার মধ্যে আছে গোরাখপুর গ্রামের ১৩১৩ একর, বাদাপাল গ্রামের ১৮৫ একর এবং কাজলহেরি গ্রামের ৩-৫ একর। ১.৬ কিমি যে 'বর্জন অঞ্চল' বা এক্সক্লুসন জোন যে কোনো নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের জন্য আবশ্যিক, অধিগৃহীত জমির মধ্যে সেই বর্জন অঞ্চল পড়ছে না। কিন্তু এই বর্জন অঞ্চলের জমির ওপর জমির মালিকদের বাস্তবত কোনো নিয়ন্ত্রণ বা অধিকারও থাকবে না। যে 'স্টেরাইল অঞ্চল' এই নিউক্লিয়ার চুল্লিকে বেড়া দিয়ে থাকা আবশ্যিক, সেই অঞ্চলেও জনসংখ্যা ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড দ্বারা

নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি— কেবল গোরাখপুর গ্রামেই ২৪ হাজার অধিবাসী বসবাস করেন। এই অঞ্চলটি হরিয়ানার কৃষিকাজের অন্যতম সক্রিয় অঞ্চল। এই অঞ্চলেই আবার হরিয়ানা রাজ্যের সেচ খাল বরাবর সবুজ বনানীর শামিয়ানা বিদ্যমান। পুরো জায়গাটি জুড়ে বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য রয়েছে— এখানে কৃষ্ণসার, নীলগাই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ময়ূরসহ নানা বৈচিত্র্যময় পাখি। অঞ্চলটি বিশনইদের (এরা অহিংসায় বিশ্বাসী) বাসস্থান হওয়ায় আমরা সরেজমিনে তদন্তের সময় বন্য প্রাণীদের নিশ্চিন্তে কৃষিক্ষেত্রে বা বাসস্থানের কাছে চড়তে দেখেছি। একটি হিসাব মতে, এই অঞ্চলে প্রায় ৪০০টি কৃষ্ণসার হরিণ রয়েছে, তার সাথে নীলগাই এবং পক্ষী-বৈচিত্র্য থাকার স্থানটি প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আদর্শ। কিন্তু সরকার এখানে একটি বিধ্বংসী নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার চেয়ে এই সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করতে চাইছে।

এই প্রকল্পের প্রস্তাবনার সময় অনেক গ্রামবাসীই প্রকল্পটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে এই প্রকল্প-র ফলে তাঁদের জমির মূল্য বাড়বে। কিন্তু আগস্ট ২০১০-এর থেকে অনেক কৃষক এই প্রকল্পের বিরোধিতায় সামিল হওয়ায় প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানা বাঁধতে থাকে। একটি কিষাণ সংঘর্ষ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির নেতৃত্বে ফতেহাবাদে যে ছোট মহাকরণ রয়েছে তার সামনে আগস্ট ১৭, ২০১০ থেকে লাগাতার অবস্থান চলছে— অবস্থানের বয়স ৭০০ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। যত সময় গেছে ততই মানুষ এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ চুল্লির জন্য সংলগ্ন অঞ্চলের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিরোধিতায় সামিল হয়েছেন। হরিয়ানার একটি সচেতন গোষ্ঠী গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই প্রস্তাবিত নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ চুল্লির কুফল সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। খেয়াল রাখা দরকার যে হরিয়ানার মতো স্থানে কখনও জমি নিয়ে কোনো সত্যিকারের সংগ্রাম কখনও হয়নি। সেই হরিয়ানাতেই ফুকুসিমা বিপর্যয় ঘটার আগেই জমি নিয়ে এই লড়াই শুরু হয়েছে, ফুকুসিমা-র পরে যা বাড়তি জোর পেয়েছে। দু বছরেরও বেশি সময়সীমা জুড়ে যে সংগ্রাম চলছে, তাতে দুজন কৃষক অত্যধিক শীত এবং গ্রীষ্মে ধরনায় বসার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। হরিয়ানা সরকার কৃষকদের সংগ্রাম থেকে বিরত করার জন্য প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অত্যধিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি চাকরির প্রস্তাবও রেখেছে— কিন্তু এত সব প্রলোভন উপেক্ষা করে সংগ্রাম আজও চলছে। এই সংগ্রামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঐ সকলের সনাতনী ঘরানার পুরুষ-প্রধান সমাজের পর্দানসীন মহিলারাও সংগ্রামে বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ্যেই যোগ দিচ্ছেন।

সম্প্রতি সংগ্রাম বেশ খানিকটা ধাক্কা খেয়েছে বলা যায়। সংগ্রামরত কৃষকদের একটি বড় অংশ হুমকির মুখে পড়ে, খানিকটা প্রলুব্ধ হয়েও, ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করেছেন। কৃষক পরিবারগুলোর পক্ষে কোটি টাকার প্রলোভন ছাড়া কঠিন, যদিও ৩৫ শতাংশ কৃষক পরিবার এই ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন যে তাহলে তাদের উপস্থিতিতেই ওখানে নিউক্লিয়ার চুল্লি স্থাপিত হোক! এই বিষয়ে মহিলাদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উচ্চনাদ। মহিলাদের অনেকে প্রকাশ্যে বলছেন যে, "আমরা তো নিজেরা মা, জমি আমাদের কাছে মা-এর মতো। কীভাবে আমরা মাকে বেচে দেবো?" উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হলো, আশপাশের গ্রামের কৃষকরা এই সংগ্রামে যোগ দিচ্ছেন, চাঁদা তুলে সংগ্রামীদের সাহায্য করছেন।

হরিয়ানার মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলির এই সংগ্রামের দিকে নজর রয়েছে, অনেকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করে নিয়ন্ত্রণে উৎসুক। যেমনটি ভাবা গিয়েছিল ঠিক সেই পথ ধরে কংগ্রেস এই প্রকল্প শুরু করার জন্য জোরদার সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। হিসারে যে লোকসভার অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, তাতে হরিয়ানা জনহিত কংগ্রেসের পক্ষের প্রার্থী কুলদীপ বিশনই প্রকাশ্যেই এই সংগ্রামের প্রতি তাঁর সমর্থন করেন। সিপিআই-এম দলের কিছু প্রভাব রয়েছে হরিয়ানার গ্রামীণ অঞ্চলে, তারাও এই সংগ্রামের প্রতি আপাত সমর্থন জানিয়েছে। ভারতীয় জাতীয় লোকদল গোরাখপুর-এ এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ চুল্লি বিষয়ে একটি বৃহৎ গণ জমায়েত সংগঠিত করে, যেখানে প্রায় দশ হাজার মানুষ অংশ নেন। সংগ্রামের মঞ্চ থেকে এই জমায়েতে আমি বক্তব্য রাখি। এই মঞ্চেই ওম প্রকাশ চৌথালা ঘোষণা করেন যে তাঁর দল আগামী নির্বাচনে বিজয়ী বা পরাজিত যা-ই হোক না কেন, তাঁরা এই অঞ্চলে এই বিপদজনক প্রকল্প রূপায়িত হতে দেবেন না। সংগ্রামরত মানুষ কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার বিপদ সম্পর্কে অবহিত, তাঁদের আশঙ্কা যে এর ফলে সত্যিকারের সংগ্রামী গোষ্ঠীটি প্রান্তিক হয়ে পড়তে পারেন। কিষাণ সংঘর্ষ সমিতি আরও প্রসারিত হয়ে এলাকা বাঁচাও আন্দোলন-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। সারা হরিয়ানা জুড়ে হরিয়ানা পরমাণু সনিয়ন্ত্র বিরোধী মোর্চা এই নিউক্লিয়ার চুল্লির বিপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

হরিয়ানার রাজনীতির জটিল আবর্তের মধ্যে থেকে নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী এই সংগ্রাম কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন— কীভাবে এই সংগ্রামের লক্ষ্য বজায় রাখা যায়, কীভাবে নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েও বৃহত্তর সহায়ক শক্তির সমাবেশ ঘটানো যায় তা নির্ধারণ করার চ্যালেঞ্জ।

রাওয়াতভাটা— রোগ, মৃত্যু আর শোষণের করুণ কাহিনী

রাজস্থান রাজ্যের কোটা শহর থেকে ৬৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত রাওয়াতভাটা এ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন বা আরএপিএস গত চার দশক ধরে চলছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম দুটি চুল্লি ছোটো আকারের। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি কেমনভাবে চলে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উপস্থিতির কারণে স্থানীয় মানুষ এবং কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিকদের শরীর-স্বাস্থ্যের ওপর কেন্দ্রটির প্রভাব কেমন তা যাচাই

করার জন্য এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ডাঃ সুরেন্দ্র এবং ডঃ সংঘমিত্রা গাদেকার এই বিষয়টি নিয়ে একটি সুবিস্তৃত এবং গভীর সমীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংলগ্ন অঞ্চলে জন্মগত খুঁত বেড়েছে বহুগুণ, যেখানে দূরবর্তী গ্রামে এই হার যথেষ্ট কম (যেমন, নিউক্লিয়ার চুল্লি দুটি বসার আগে সমগ্র অঞ্চলে জন্মগত খুঁতের পরিমাণ ছিল হাজারে ৫, চুল্লি বসার পর সংলগ্ন অঞ্চলে তা বেড়ে হয়েছে হাজারে ৪৫— বৃদ্ধির হার ৯ গুণ!)

রাওয়াতভাটার চুল্লি যে সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি করছে তা কেবল রাশিবিজ্ঞানের বিষয় নয়। তা অহরহ বিয়োগান্ত কাহিনীর জন্ম দিয়েই চলেছে।

কেবলমাত্র সংলগ্ন অধিবাসীদের জন্যই নয়, সংস্থার শ্রমিকদের প্রতি এই সংস্থাটি যে কেমন নির্দয়, সে বিষয়ে এই চুল্লি ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের খাঁটি চরিত্রটি উদ্ঘাটিত করেছে। বহু বছর ধরেই রাওয়াতভাটা সহ অন্যান্য নিউক্লিয়ার চুল্লির কর্তৃপক্ষ তেজস্ক্রিয়-বিকিরণ প্রবণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলি অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করে সম্পন্ন করে থাকেন। যখনই এই শ্রমিকরা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অতিরিক্ত মাত্রার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হন, তখনই তাঁদের স্রেফ ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। এর ফলে তাঁদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁরা নিজেদের বাসস্থান বা গ্রামে ফিরে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা-জনিত স্বাস্থ্যহানির শিকার হন। কিন্তু তাঁদের এই অসুখ, স্বাস্থ্যহানি বা মৃত্যুকে তখন আর সরাসরি নিউক্লিয়ার চুল্লির বিকিরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না (যদিও তাঁদের স্বাস্থ্যহানি বা মৃত্যুর কারণ চুল্লির থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ)। এই ভয়াবহ অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্প্রতি জনসমক্ষে এসেছে। রাওয়াতভাটাতে দুজন অস্থায়ী শ্রমিক তেজস্ক্রিয় ট্রিটিয়াম দ্বারা প্রভাবিত হলে তাঁদের একজন, শ্রী নন্দকিশোর মেহেরকে ১৫০০ টাকা দিয়ে যথেচ্ছ পরিমাণ বিয়ার কিনে খেতে বলা হয়। মনে করা হয়েছিল, অতিরিক্ত বিয়ার পান করার ফলে তাঁর দেহ থেকে ট্রিটিয়ামের বিষক্রিয়া নিঃসৃত হয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন ডাক্তারি নজরদারির আওতায় রাখার পর তাঁকে চিকিৎসার জন্য যাওয়াতে বাধা দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার যে এই ডাক্তারি সুবিধাটি নিউক্লিয়ার চুল্লিতে কর্মরত ব্যক্তিরা তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত হয়েছে। একই কাহিনী ভারতের নানা স্থানের নিউক্লিয়ার চুল্লিতে পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের ইউনিয়ন এই বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমেছেন।

যদিও কোদানকুলাম-এ বা জইতাপুরে বা গোরাখপুরে যে তীব্রতায় আন্দোলন চলছে, রাওয়াতভাটার আন্দোলন তেমন জোরালো হয়নি, কিন্তু স্থানীয় মানুষরা বুঝতে শুরু করেছেন যে তাঁদের এলাকায় তাঁরা নিউক্লিয়ার চুল্লির রূপধারী এই দৈত্যকে বাস করার অনুমতি দিয়ে কী মূল্য দিচ্ছেন। ২০১২-র জুলাই মাসে হায়দ্রাবাদ-ভিত্তিক নিউক্লিয়ার সংস্থা নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্স এই অঞ্চলে আবার বছরে ৫০০ টন বর্জ্য নিউক্লিয়ার পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা শুরু করে, তখন স্থানীয় মানুষ এই বিষয়ে সংগঠিত জনশুনানি করতে সক্রিয় বাধা দেন। তাঁরা ঐ শুনানি স্থলে রাওয়াতভাটা কর্তৃপক্ষের তরফে বহু বছর ধরে ঘটানো, অনেক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অনেক বেআইনি কাজ এবং আইন লঙ্ঘনের বিষয় সামনে আনেন। আন্দোলনের কর্মীরা খোদ হায়দ্রাবাদেই ভূমিজলে তেজস্ক্রিয় দূষণের বিষয়টি সামনে আনেন। হায়দ্রাবাদের নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্সটি মৌলালি অঞ্চলে শহরের মধ্যে অবস্থিত, রেলগাড়ি করে সেকেন্দ্রাবাদ গেলে রেলগাড়ি থেকেই এই নিউক্লিয়ার সংস্থাটির নির্মাণ চোখে পড়বে। অশোকনগর অঞ্চলের অধিবাসীরা কেমনভাবে অসহায়ের মতো দিনের পর দিন এই তেজস্ক্রিয় দূষণের কবলে রয়েছেন, তা-ও আন্দোলনের কর্মীরা সামনে আনেন।

চুট্খা— আদিবাসীদের ওপর তিন আঘাত

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা বর্গি বাঁধ নামে পরিচিত নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের প্রথম বাঁধের ধাক্কায় একদফা উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন। তখন এই বিষয়ে আজকের মতো সচেতনতা এবং প্রচার না থাকায় এঁদের জোর করে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছিল। বর্গি বাঁধের ফলে বিস্থাপিত মানুষদের এক অংশ চুট্খা এবং সংলগ্ন গ্রামগুলোতে বসতি স্থাপন করেন। এখন ভারতের 'নির্মম বিকাশ কর্মসূচি'-র ফলে তাঁরা পুনর্বার বিস্থাপিত হতে চলেছেন। ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা চুট্খা-তে বর্গি বাঁধের জলের লভ্যতা হিসেব করে একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছেন। এই নিউক্লিয়ার চুল্লিটি স্থাপন করার জন্য প্রায় ১২টি গ্রামের অধিবাসী বিস্থাপিত হবেন। প্রস্তাবটি যদিও এখনও প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু জমি জরিপ এবং জমি সংক্রান্ত নানা সমীক্ষা জারি রয়েছে।

গ্রামগুলিও এই বিধ্বংসী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছেন। এই প্রকল্পের সবচেয়ে কাছের শহর জব্বলপুরও এই নতুন হুমকির বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। এই মধ্যপ্রদেশেই চের্নোবিলের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় পরিবেশ-বিপর্যয়কারী ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার দায়ভার আজও ভারত সরকার নেয়নি। ফলে মানুষের ক্রোধ জমছে। দুবার বিস্থাপনের ধাক্কার পর মানুষদের জন্য অপেক্ষা করে আছে এক তৃতীয় ধাক্কা। নিউক্লিয়ার চুল্লি চালু হলে বর্গি বাঁধ থেকে জল তুলে চুল্লি শীতল করার কাজ চালানো হবে, ফলে প্রস্তাবিত যেসব এলাকায় সেচের জল যাওয়ার কথা, কৃষিকাজের জন্য সেই জল আর মিলবে না। চুল্লি থেকে বহু দূরে অবস্থিত ভাটার দিকের কৃষকরা না পাবেন চুল্লির বিদ্যুৎ, না পাবেন সেচ খালের জল। চুল্লির জন্য জলের লভ্যতা বাড়াতে যদি জলাধারে অতিরিক্ত জল ধরে রাখা হয়, তবে ভাটির দিকে জলের যোগান কমবে, এবং সমগ্র নর্মদা উপত্যকা পরিকল্পনাটি আরও বেশি করে অরূপায়ণযোগ্য হয়ে পড়বে।

স্মরণ

এরিক হব্‌সবম

সিদ্ধার্থ গুহ রায়

২০১২ সালের ১লা অক্টোবর আমাদের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এরিক হবস্‌বম চলে গেলেন। কেবলমাত্র ইতিহাস নয়, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও হব্‌সবমের মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং অনবদ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিগত ছ' দশক ধরে ইতিহাস চর্চাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর গবেষণার পরিধি ছিল বিশাল এবং ইতিহাস চর্চার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে তাঁর বিচরণ। ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস, নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, রুশ বিপ্লব, বিশ্ব যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। এমনকী সাম্প্রতিক কালের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি, যেমন বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত তাঁর নজর এড়ায়নি। অষ্টাদশ শতকের অন্তিম লগ্ন থেকে সমকালীন ঘটনাবলী— সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁর প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। তিনি কেবলমাত্র একজন ঐতিহাসিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নিপুণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক। মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অবিচল। তথাপি হিউ ট্রেভর-রোপারের মত মার্কসবাদ বিরোধী লেখকও তাঁকে "Very accomplished historian" হিসাবে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত হননি।

১৯১৭ সালের ৯ জুন এরিক হব্‌সবম মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। একজন কমিউনিস্টের পক্ষে সালটা গুরুত্বপূর্ণ। আর সাম্রাজ্যের ইতিহাসবিদ হিসাবে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন পোল্যান্ডের অধিবাসী। সেদিক থেকে হব্‌সবম ছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন পোলিশ ইহুদি। ১৮৭০ সালে তিনি লন্ডনে আসেন। এরিকের পিতা লিওপোল্ড লন্ডনে জন্মগ্রহণ করে জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। এরিক হব্‌সবমের শৈশব কেটেছিল ভিয়েনায়। অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতামাতাকে হারিয়ে মাত্র ১৪ বছর বয়সে এরিক তাঁর এক কাকার কাছে জার্মানির বার্লিনে চলে আসেন। সে সময় জার্মানিতে ছিল হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসন।

হব্‌সবম তাঁর সুলিখিত আত্মজীবনী Interesting Times (2002)-তে লিখেছেন তিনি বার্লিনে কীভাবে কমিউনিস্ট কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি বামপন্থী ছাত্রদের মুখপত্র schulkampf (স্কুলের সংগ্রাম) বিক্রি করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি সংবাদপত্রের শিরোনাম থেকে তিনি জানতে পারেন, হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। একজন ইহুদি হিসাবে এবং অবশ্যই একজন মার্কসবাদী হিসাবে এটি ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক একটি সংবাদ। ১৯৩৩-এর ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসি দল চরম বিকৃত এবং মিথ্যে প্রচারের ও বাহুবলের সাহায্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মার্চ মাসের শেষাশেষি হব্‌সবম পরিবার বার্লিন ত্যাগ করে লন্ডন চলে আসে।

১৯৬০-এর দশকে জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিতর্ক হব্‌সবমকে একজন দক্ষ ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিয়েছিল। এঙ্গেলস এবং ম্যাক্‌লের সময় থেকেই এ বিষয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক শুরু হয়েছিল। শিল্পবিপ্লব উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল কিনা— এটাই ছিল বিতর্কের মূল বিষয়। বিভিন্ন ধরনের তথ্যসূত্রের সাহায্যে হব্‌সবম প্রমাণ করেছিলেন যে, শ্রমজীবী মানুষের কাছে শিল্প বিপ্লব ছিল একটি অভিশাপ। এ বিষয়ে তাঁর Labouring Men (১৯৬৪) এবং Industry and Empire (১৯৬৮) গ্রন্থ দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হব্‌সবসের চারটি গ্রন্থ 'Age of series' নামে বিখ্যাত। এই চারটি গ্রন্থ ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। Age of গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ Age of Revolution 1789-1848 (১৯৬২) —এর আলোচ্য বিষয় শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, একটি শিল্পাশ্রয়ী সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় গ্রন্থ Age of Capital 1848-1875 (১৯৭৫) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থান, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত ও সংকট সংক্রান্ত মনোগ্রাহী আলোচনা পাঠকদের উপহার দিয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ Age of Empire 1875-1914 (১৯৮৭) দেখিয়েছে, বৃহৎ শক্তিবর্গের সাম্রাজ্য গঠনের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, এবং এই পারস্পরিক সংঘাত ও প্রতিযোগিতার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এসেছিল ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। চতুর্থ গ্রন্থ Age of Extremes (১৯৯৪) ৬২৭ পাতায় বিশ শতকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, তৃতীয় বিশ্বের উত্থান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, এক-মেরু বিশ্বের আবির্ভাব— যাবতীয় বিষয়ের নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বইটিতে।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত Primitive Rebels গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন— সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক শক্তি বিরোধী গণ আন্দোলন অংশগ্রহণকারী কৃষক আদিবাসীদের চেতনা ছিল প্রাক্‌-আধুনিক বা আদিম (Primitive)। হব্‌সবমের আর একটি অসামান্য গ্রন্থ Bandits (১৯৬৯)-এর উপজীব্য বিষয়— যারা দস্যু বা Bandit হিসাবে পরিচিত তাঁরা বহুক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধী নন।

তাঁরা লড়াই করেছেন সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে; অন্যায্য ব্যবস্থার অবসানের দাবিতে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন। One History (১৯৯৭) গ্রন্থে তিনি ইতিহাসকে উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্বের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উত্তর-আধুনিক তত্ত্বে বিশ্বাসীদের তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন তিনি। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদি পাওয়া যাবে তাঁর Uncommon People (১৯৯৮) গ্রন্থে।

১৯৪৬-১৯৫৬ এই দশ বছর এরিক হব্‌সবম ছিলেন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য। খ্রিস্টোফার হিল, ই পি থম্পসন, জন স্যাভাইল প্রমুখ অসামান্য প্রতিভাবান ঐতিহাসিকরাও এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরির অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

ইতিহাসের বাইরে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল জাজ বাদ্যে। ১৯৫০-এর দশকে 'ফ্রান্সিস নিউটন' ছদ্মনামে তিনি জাজ বাজানোর আঙ্গিক নিয়ে বেশ কিছু সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখেছিলেন *New Statesman* পত্রিকায়। ১৯৫৯ সালে পেঙ্গুইন প্রকাশনা হিসাবে নিবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। বেশ কয়েক বছর পর জানা যায় 'ফ্রান্সিস নিউটন' এরিক হব্‌সবমের ছদ্মনাম।

মার্কসবাদে অবিচল আস্থা রাখার জন্য এরিক হব্‌সবমকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। এর জন্য দায়ী ছিল ম্যাক্‌কার্থিবাদের ব্রিটিশ ঘরানা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পদপ্রাপ্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে তিনি বার্কবেক মহাবিদ্যালয়ের পূর্ণ অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন।

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁকে ১৯৯০-এর দশকে নেইল কিনক ও নব্য শ্রমিক দলের (New Labour) কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু টনি ব্লেয়ারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা এবং ইরাক যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা তাঁর সঙ্গে নব্য শ্রমিক নেতৃত্বের বিচ্ছেদ ঘটায়।

মার্কসবাদের প্রতি আস্থাশীলদের কাছে এই সময়টা বড় দুঃসময়। বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের খোলাখুলি পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ মার্কসবাদে একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের কাছে আদৌ সুসংবাদ নয়। কিন্তু এই কঠিন সময়েও হব্‌সবম তাঁর কম্যুনিস্ট মতাদর্শ ভুলে যাননি বা বামপন্থী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, যদিও সমসাময়িক অনেক তথাকথিত বামপন্থী কার্যকলাপের তিনি ছিলেন একজন কঠোর অথচ সংবেদনশীল সমালোচক। এরিক হব্‌সবমের মৃত্যু বামপন্থী ইতিহাস চর্চার একটা সুবর্ণযুগের অবসান ঘটালো।

হান সুইন স্মরণে

চীনা প্রযুক্তিবিদ পিতা এবং বেলজিয়ান মাতার কন্যা হান সুইন ২ নভেম্বর ২০১২ প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে উত্তর-মধ্য চীনের হেনান প্রদেশে এলিজাবেথ কুয়ানগু চৌ নামের যে বালিকাটি জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই পরবর্তীকালে লেখিকা হান সুইন হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে তাঁর চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যয়ন চালিয়ে যান। ব্রাসেল্‌স-এ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করে বিপ্লবোন্মুখ চীনে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ১৯৩৮-এ ইউনান প্রদেশের একটি ফরাসি হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৯-এ যখন চিয়াং কাই সেক সরকার জাপানের হাতে হুয়ান ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন হান সুইন চিয়াং কাই-সেকের সঙ্গে একই নোকায় যাত্রী হয়ে সেই পলায়নের সঙ্গী হন।

চীনের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগ অটুট ছিল। পৃথিবীর যে প্রান্তেই তিনি চিকিৎসা বা লেখালেখি বা অন্যান্য কাছে ব্যস্ত থেকেছেন, সেখানেই তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে চীনই প্রাধান্য পেয়েছে। নানা সমলোচনা সহ তিনি চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে স্বাগত জানান। 'গন্তব্য চুংকি' (১৯৪২) নামে চিয়াং কাই-সেক-এর সঙ্গে পলায়নের কাহিনী যে পুস্তক তিনি হান সুইন ছদ্মনামে প্রকাশ করেন, সেই কাহিনী চীনের সংগ্রামের সপক্ষে অনেক ইউরোপীয় সুহৃদ সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে— বিশেষত বার্ট্রান্ড রাসেল এই বইটি পাঠ করে চীন প্রেমিক হয়ে ওঠেন। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রায় আমৃত্যু তিনি নিয়মিত চীন ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। চীন বিপ্লব এবং মাও-কে নিয়ে তাঁর লেখা মর্নিং ডেলিউজ (১৯৭২), উইন্ড ইন দ্য টাওয়ার (১৯৭৬), চায়না ইন দি ইয়ার ২০০১ (১৯৬৭), এল্ডেস্ট সন : চৌ এন লাই এ্যান্ড দি মেকিং অফ মডার্ণ চায়না (১৯৯৪) ইত্যাদি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক। অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা হান সুইন-এর তিন খণ্ডে আত্মজীবনী, [দি ক্রিপলড ট্রি (১৯৬৫), *আ মর্টাল ফ্লাওয়ার* (১৯৬৬) এবং *বার্ডলেস সামার* (১৯৬৮)], এবং *মাই হাউস হ্যাজ দু ডোরস* (১৯৮০) পাঠক মহলে বহুল পঠিত। ১৯৫২ সালে লেখা আ মেনি সপ্লেন্ডার্ড থিং চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়।

পদানত চীনে জন্ম নিয়ে হান সুইন এক প্রকৃত আন্তর্জাতিক জীবনযাপন করে গেছেন আমৃত্যু। বিদেশে চীনের সুহৃদ হিসেবে তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ ভূমিকা।

তাঁর মৃত্যু গত শতকের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ের সঙ্গে বর্তমান কালের নাড়ির যোগকে ছিন্ন করে দিল। 'অনীক' তাঁর কর্ম জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

স্মরণ

কুং চিংলান কোটনিস স্মরণীয় হয়ে থাকবেন

মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত

শ্রীমতি কুও চিংলান কোটনিস প্রয়াত হয়েছেন ২৮ জুন, ২০১২, ৯৬ বছর বয়সে, চীনের তালিয়েন শহরে। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যা২ল মিশনের (১৯৩৮-৪৩) অন্যতম সদস্য ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিসের সঙ্গে কুও চিংলিনের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২৫ নভেম্বর। ডাঃ কোটনিস ১৯৪২ সালে অকালে প্রয়াত হন। ডাঃ কুও চিংলান ডাঃ কোটনিসের আদর্শ প্রচারে, চীন-ভারত মৈত্রী স্থাপনে সারা জীবন কাজ করেছেন।

কুও চিংলানের জন্ম ১৯১৫ সালে, উত্তর চীনের ফেনিয়াং নামে ছোট শহরের এক নিম্নবিত্ত পরিবারে। ঐ শহরের এক মিশনারি হাসপাতাল থেকে তিনি ১৯৩৬ সালে নার্সিং পাশ করেন।

স্কুলে পড়ার সময়েই ১৯৩১ সালে জাপান চীনের অংশ দখল করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই জাপানি আগ্রাসন ও দখলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জন্ম নেয়। চীনের কুওমিনটাং সরকারের প্রধান চিয়াং কাইশেক জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করে চীনের জনগণের সামন্ত শোষণ বিরোধী নানা আন্দোলনকে সশস্ত্র উপায়ে দমন করতে উদ্যোগী হন। এর বিপরীতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে এবং কুওমিনটাং-এর সঙ্গে যৌথভাবে জাপবিরোধী যুদ্ধের আহ্বান রাখে। কুও চিংলানের মনে তার প্রবল ছাপ পড়ে। নার্সিং পড়ার সময় ফেনিয়াং হাসপাতালে বেশ কিছু সৈন্য ভর্তি হয় যারা কুওমিনটাংয়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জন্য মুক্তিযুদ্ধে গুরুতর আহত হয়। তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে তাঁর মনে যুদ্ধ সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য তিনি বুঝতে পারেন, কোন্‌টা ন্যায় যুদ্ধ আর কোন্‌টা অন্যায় যুদ্ধ।

নার্সিং পাশ করার পরে তিনি পিকিংয়ের বড় হাসপাতাল ইউনিয়ন মেডিক্যাল কলেজে কাজ শুরু করেন। খুব খুশিতেই ছিলেন। ১৯৩৭ সালে জাপান পিকিং শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাপানিরা নানা অছিলায় হাসপাতালের মধ্যে জাপবিরোধী কোনো লেখাপত্র আছে কিনা তল্লাসি করতে জিনিসপত্র তছনছ করত। একদিন রাস্তায় এক জাপানি বালক কুও চিংলানের দিকে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলতে লাগল— 'পরাধীন দেশের ক্রীতদাসকে মারো'। কুও চিংলানের মনে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সহযোগীদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ক্যাথরিন হল নামে নিউজিল্যান্ডের এক মিশনারি মহিলার (যিনি জাপানি বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে মুক্তাঞ্চলে ওষুধ, চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদি গোপনে পাঠাতেন) সাহায্যে কুও চিংলান কমিউনিস্ট পার্টির অধীন অষ্টম রুট বাহিনীর নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ১৯৩৯ সালের মে মাসে চীনের মুক্তাঞ্চলে চলে যান।

কুও চিংলান ছিলেন জাপবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের শাংসি হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের নর্মান বেথুন মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। মিশনারি স্কুলে লেখাপড়া করা, তাই ইংরাজি লিখতে ও বলতে পারতেন। চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের দুই সদস্য ডাঃ বিজয় বসু ও ডাঃ কোটনিস কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত অষ্টম রুট বাহিনীর অধীনে কাজ করার জন্য এখানে আসেন। এখানেই ১৯৪০ সালের জুন মাসে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। ডাঃ বসু এখান থেকে ইয়েনানে ফিরে যান। ডাঃ কোটনিস এখানে নর্মান বেথুন আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতালে কাজ করতে থাকেন।

এই হাসপাতালে কাজ করার সময় কোটনিস ও কুও চিংলান নিজেদের চিন্তাভাবনা বিনিময় করেন। ডাঃ কোটনিস অস্ত্রোপচার করতেন, সার্জারি পড়াতেন। তিনি চীনা ভাষায় সহজপাঠ্য ডাক্তারি বই (সার্জারি) লিখতে শুরু করেন। ডাঃ কোটনিসের এই সব কাজে সহায়তা করতেন কুও চিংলান। ডাঃ কোটনিস একজন বিদেশি, চীনের প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রতিকূল পরিবেশে (ভারতের মহারাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই) চীনের মানুষের ফ্যাসিবিরোধী ও শোষণ মুক্তির সংগ্রামে যেভাবে কষ্ট সহ্য করে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তা দেখে কুও চিংলানের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সৃষ্টি হয়। কাজের মাধ্যমে এবং জীবনযাত্রায় যোগাযোগ বাড়তে লাগল, পারস্পরিক বোঝাপড়া অনেক বেশি হলো। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম, সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম কোটনিসকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কোটনিস চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কুও চিংলানও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

দুজনের অনুরাগ বিয়েতে পরিণত হয়। কোটনিস ও কুও চিংলান বিয়ের পরও জাপবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে একই রকম সক্রিয় ছিলেন। কেবল শনিবারগুলোতে তাঁরা বাড়িতে মিলিত হতে পারতেন। কুও চিংলান লিখেছেন, তাঁদের বিবাহিত জীবনের এক বছরে মোট একমাস হয়ত তাঁরা একসঙ্গে থাকতে পেরেছিলেন। কারণ, ১৯৪১-৪২ সালে জাপবিরোধী সংগ্রাম খুব কঠিন অবস্থায় পৌঁছায়। জাপান সে সময় যে নীতি নিয়েছিল

তা হলো— সব কিছু পুড়িয়ে ফেল, সবাইকে মেরে ফেল, সব কিছু লুট করে নাও। এই ঝোঁটিয়ে বিদায় অভিযান-এর সময় অনেক বেশি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে মুক্তাঞ্চলের মানুষদের পক্ষে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে প্রতিরোধ করা ছাড়া উপায় ছিল না। কোটনিস এবং কুও চিংলানকে এইরকমভাবে স্থান বদল করতে হতো, নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান ছিল না, একেকবার একেকজন কৃষকের বাড়িতে থাকতে হতো, হাসপাতালও ছিল বিভিন্ন কৃষকের বাড়িতে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের কাছাকাছি জায়গায় চলমান হাসপাতাল নিয়ে কোটনিস হাজির থাকতেন, যাতে আহতদের খুব দ্রুত সারিয়ে তোলা যায়। প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো, হাসপাতালের সরঞ্জাম নিজেদের বইতে হতো। খাবার শস্যদানা ছিল না, তাই একরকম গাছের ছাল দিয়ে তৈরি প্যানকেক খেতে হতো। প্রায় দিনে ৬০ লি (প্রায় ২০ কিমি) হাঁটতে হতো। এমতাবস্থায় দুজনের একসঙ্গে থাকার সুযোগ কম হতো। কুও চিংলানের গর্ভাবস্থায়ও একই ভাবে কাজ করতে হতো।

১৯৪২ সালের ২৩ আগস্ট তাঁদের এক পুত্রসন্তান হয়। চীনের ঐ মুক্তাঞ্চলের সামরিক কম্যান্ডার-ইন-চিফ নাম দিয়েছিলেন 'ইন হুয়া', অর্থাৎ ভারত-চীন (উচ্চারণ বিশেষে অর্থ হয় ভারতের ফুল)। অল্পদিন পরেই, ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর উত্তর চীনের এক প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে ডাঃ কোটনিস মাত্র ৩২ বছর বয়সে মারা যান। ভারতে ফিরে ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল ডাঃ কোটনিসের, সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল। ডাঃ কোটনিসের মৃত্যুর পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে সন্তান সহ কুও চিংলানকে পার্টির প্রধান দপ্তর ইয়েনানে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৪৩ সালে। কুও চিংলান এর পর ডাক্তারি পাশ করেন। চীন মুক্ত হবার পর তিনি ১৯৫৬ সালে তালিয়েন শহরে শিশুদের চিকিৎসাকেন্দ্রে কাজ করতে চলে যান। ১৯৮৬ সালে অবসর নেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালে সিয়ান মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারির ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ার সময় চিকিৎসা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁদের সন্তান ইনহুয়া-র।

অবসরের পরেও নানা ধরনের কাজে কুও চিংলান নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বিপ্লবী চেতনা যাতে সজীব থাকে তাই রাজনৈতিক পড়াশুনা করতেন নিয়মিত। কুও চিংলান লিখেছেন, সুস্থ শরীরের জন্য সুস্থ মন একান্ত প্রয়োজন। তাই বিপ্লবের দিনের সংগ্রামের কথা বারবার স্মরণ করতেন। বিপ্লবের দিনের বিভিন্ন চলচ্চিত্র দেখা ও গান শোনার অভ্যাস ছিল। এছাড়াও ভারত-চীন মৈত্রী স্থাপনে এবং কোটনিসের আদর্শ প্রচারে নানা কাজ, ইত্যাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ডাঃ কোটনিসের ওপর একটি ভালো প্রদর্শনী তৈরির চিন্তাও তাঁর ছিল।

কুও চিংলান মোট পাঁচ বার ভারতে এসেছিলেন। প্রথমবার এসেছিলেন পুত্র ইনহুয়াকে নিয়ে। মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে কোটনিসের বাড়িতে ছিলেন। ভারতে আসার আগে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এনলাই ইনহুয়াকে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে চীন ও ভারতের জনগণের সেবা করতে হবে, এবং ভারতের গঠনকাজেও তার ও তার বন্ধুদের যোগ দেওয়া উচিত। বলেছিলেন, তাকে বাবার মতো আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে হবে।

১৯৮৫ সালে এবং ১৯৯২ সালে কলকাতায় এসেছিলেন কোটনিস কমিটির আমন্ত্রণে। কোটনিস কমিটির কয়েকটি শাখা চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন। ১৯৮৫ সালে নব ব্যারাকপুর শাখা, ১৯৯২ সালে বেগমপুর শাখা। ডাঃ কোটনিসের আদর্শে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমে কোটনিস কমিটির কর্মীরা কাজ করে চলেছেন দেখে তিনি অভিভূত হন। কুও চিংলানকে 'জনগণের রাষ্ট্রদূত' হিসাবে ভূষিত করা হয়েছে। ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনে তিনি বারবার ভারতে এসেছেন।

১৯৭৮ সালে বিজয় বসু তাঁর চারজন ডাক্তার ছাত্রকে চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন আকুপাংচারের উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য। সেই দলে আমিও ছিলাম। আমরা তালিয়েন শহরে কুও চিংলানের বাড়িতে যাই। তখন তিনি তালিয়েন শহরের হাসপাতালে শিশুরোগ চিকিৎসক। কুও চিংলান ও বিজয় বসু পুরনো স্মৃতিচারণ করেন। কুও চিংলান আমাদের বলেন, ডাঃ কোটনিস স্তালিনের লেখা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বইয়ের সেই অংশটি প্রায়ই পড়তেন যেখানে গ্রীক পুরাণের কাহিনীর উল্লেখ করে স্তালিন লিখেছিলেন, বীর অ্যান্টিউসকে যদি মাটি থেকে উপরে তুলে ফেলা যায় তবেই তাকে মারা যাবে, এবং এভাবেই তাকে মারা হয়েছিল। তেমনি কমিউনিস্টরা যদি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তারাও পরাজিত হবে।

চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের ঐতিহ্য মহান। কারণ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব পৃথিবীর সব জাতির এক সম্পদ। মেডিক্যাল মিশনের এক সদস্য ডাঃ কোটনিস প্রাণ দিয়েছিলেন এই মহান কাজে। আর এক সদস্য ডাঃ বিজয় বসু (১৯১২-১৯৮৬) সারা জীবনব্যাপী ভারত-চীন মৈত্রীর জন্য, আমাদের দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। মেডিক্যাল মিশনের সঙ্গে যুক্ত ডাঃ কুও চিংলান কোটনিস সারা জীবনব্যাপী কোটনিসের আদর্শ প্রচারে সহায়তা করেছেন। কুও চিংলান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লেখাটিতে কুও চিংলান কোটনিসের লেখা 'মাই লাইফ উইথ কোটনিস' (২০০৬) বইটির অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছে

বিতর্ক : কানোরিয়া

সমস্ত কুৎসা অগ্রাহ্য করে শ্রমিকদের লড়াই জারি আছে

গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে কুশল দেবনাথের প্রতিবেদনটি সম্পর্কে প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রচণ্ড আপত্তি জানান, এবং শেষে আমাদের অনুরোধে জুলাই মাসে 'অনীক'-এর ৩৫-৪০ পৃষ্ঠা মাপের একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠন। পরে আমাদের অনুরোধে আগস্ট মাসে সেটি সংক্ষিপ্ত করে পাঠান। সেই লেখায় মূল লেখাটির প্রসঙ্গ ছাড়াও লেখকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বক্তব্য শ্রীচক্রবর্তীর প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে আমাদের পত্রিকার অনুসৃত নীতি অনুসারে সম্পাদনা করে আমরা প্রকাশ করছি। সাথে থাকছে মূল লেখকের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য। —সম্পাদকমণ্ডলী অনীক

ভূমিকা-১

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '১২ সংখ্যার 'অনীক'-এ প্রকাশিত কুশল দেবনাথের 'কানোরিয়া জুট-শ্রমিক আন্দোলন : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় কয়েকটা গোড়ার কথা।

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর কানোরিয়া আন্দোলনের বন্ধুদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। অনেকে যেমন বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়েছেন, 'জোরদার জবাব' দাবি করেছেন, তেমনি আবার কেউ কেউ বলেছেন, এসব জঘন্য মিথ্যা কুৎসাকে আদপে পাত্তা না দেওয়াই হচ্ছে আসল জবাব। সমবেত প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় আমার মনে হয়েছিল, কুৎসার জবাব তো নয়, বরং কুৎসার মুখোশ খুলে দিয়ে কানোরিয়া আন্দোলনের মর্মকথা নতুন করে মানুষের সামনে আসা দরকার, অনীক'-এর পাঠকদের কাছে তো বটেই। সেই উদ্দেশ্যেই কলমও ধরেছিলাম। কিন্তু ইতিবৃত্তের কলেবর যা দাঁড়াল, তাতে 'অনীক'-এর সম্পাদক তাঁর কাগজে স্থান-সঙ্কুলান করতে পারলেন না। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হল, মূল লেখাটি আমরাই ছেপে বিলি করব আর অনীকের জন্য ছোট এই লেখা।

ভূমিকা-২

শ্রী দেবনাথের লেখা পড়ে প্রথমেই মনে হল, শ্রমিক আন্দোলনবিরোধী জঘন্য মিথ্যা কুৎসামূলক এমন লেখা অনীকের পাতায় এর আগে কখনও দেখিনি। একজন ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে গিয়ে একটা গোটা শ্রমিক আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টার এ এক নতুন নজির বৈকি। শুধু তাই নয়, এই 'বড়' কাজের পাশাপাশি আর একটি বড় কাজও লেখক কৌশলে সেরে ফেলতে চেয়েছেন। তা হল— বর্তমান শ্রমমন্ত্রীর মদতে ফড়ে ফাটকাবাজ প্রমোটার মি. শিবশঙ্কর পাসারি কানোরিয়ার শ্রমিকদের ওপর নতুন করে যে হিংস্র হামলা নামিয়ে এনেছে, তাকে যথাসম্ভব আড়াল করা।

শ্রী দেবনাথের প্রবন্ধটি একটু খুঁটিয়ে পড়লেই আমাদের কথার সত্যতা বোঝা যাবে। গতবছর আগস্ট মাসে (২০১১) কানোরিয়া জুটমিল খোলার ঘটনাকে শ্রী দেবনাথ 'ভাসা ভাসা' করে দেখাতে চেয়েছেন। একথা তিনি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি যে এই তথাকথিত মিল খোলার প্রস্তুতিপর্বে ২০১১-র জুন মাস থেকেই শ্রমিকদের একমাত্র নিজস্ব সংগঠন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের ওপর শ্রমমন্ত্রীর মদতপুষ্ট কী ভয়ঙ্কর মালিকি আক্রমণ নেমে এসেছিল। গায়ের জোরে জবরদস্তি মিলগেট থেকে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই শুধু নয়, নতুন শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি ফতোয়া জারি করে এমনকি সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের আইনি অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টাও হয়েছে। এইসব ভয়ংকর অগণতান্ত্রিক কাজের বিরোধিতা শ্রী দেবনাথ কেন করেননি, সেসব কথাই প্রসঙ্গত ক্রমে ক্রমে আসবে। আপাতত শ্রী দেবনাথের একটি মন্তব্যের অংশবিশেষের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেখানে তিনি বলেছেন, "এই মুহূর্তে কোন্ ইউনিয়নের দিকে বেশিরভাগ শ্রমিক আছে তা বলা অর্থহীন..."। মন্তব্যটি যে করা হয়েছে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কেই, তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন এই যে, যখন মার খাওয়া কানোরিয়ার শ্রমিকরা তাঁদের নিজস্ব ইউনিয়ন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নকে আঁকড়ে ধরে লড়াইয়ের ময়দানে ধীরে ধীরে আবারও মাথা তোলার চেষ্টা করছেন আর তার জন্য হামলার মুখোমুখিও হচ্ছেন, তখন এরকম মন্তব্য করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের ইউনিয়নকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত প্রোমোটার পাসারি আর বর্তমান শ্রমমন্ত্রী সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে প্রচ্ছন্ন মদত যোগানোরই কি এক যথেষ্ট নমুনা নয়?

প্রসঙ্গ : শ্রী দেবনাথের তিন মিথ্যা

নতুন শ্রমমন্ত্রীর উদ্যোগে কানোরিয়া জুটমিল খোলানোর ঘটনাকে ঘিরে শ্রমিকদের ওপর মালিকি আক্রমণের বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রী দেবনাথ যে তিনটি ঘোর মিথ্যা পরিবেশন করছেন, এখন আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। মিথ্যা তিনটি যথাক্রমে— (১) কানোরিয়া জুটের ৭৫ শতাংশ শ্রমিক লড়াই থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, (২) বেশিরভাগ শ্রমিকই সংগঠিত লড়াইয়ের অবস্থানে নেই, আর (৩) বেশিরভাগ শ্রমিকই চেয়েছিল কারখানা যেভাবে হোক খুলে যাক।

কুশল দেবনাথের এই তিনটি প্রতিপাদ্যই ঘোর মিথ্যা কেন? প্রথমত, ফড়ে ফাটকাবাজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে কানোরিয়া জুটের শ্রমিকদের ওপর মালিক অর্থাৎ প্রোমোটার, সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও গুন্ডা বদমায়েশদের সম্মিলিত চক্র যে লাগাতার হিংস্র হামলা চালিয়েছে, রুটি-রুজি কেড়ে নিয়ে বছরের পর বছর টিঁকে

থাকাটাই অসম্ভব করে তুলতে চেয়েছে শ্রমিকদের লড়াই করার ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দিতে, চেষ্টা চালিয়েছে তাঁদের সংগঠিত লড়াইয়ের একমাত্র মঞ্চ সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নকে ধ্বংস করে দেবার— সেসবের আভাসটুকুও তিনি কোথাও দেননি। আক্রান্ত শ্রমিকের মার খেতে খেতে বেদম হয়ে পড়াটাকেই তিনি বড় করে তুলেছেন, ভয়াবহ আক্রমণের মোকাবিলায় বেদম শ্রমিকের আবারও মাথা তুলে দাঁড়ানোর অদম্য চেষ্টার মহান গাথা তিনি স্রেফ চেপে গেছেন।

দ্বিতীয়ত, অবর্ণনীয় আক্রমণ মোকাবিলা করে আজও কানোরিয়া শ্রমিক মিল বাঁচিয়ে নিজেদের বাঁচানোর যে অনবদ্য লড়াই চালাচ্ছেন, প্রোমোটার পাসারিকে হটিয়ে দিয়ে শিল্প শ্রমিক সমবায়ের মাধমে মিল চালানার যে অভূতপূর্ব লড়াই জারি রেখেছেন, তার সবটাই সংগঠিত লড়াই। আজকের ভয়ংকর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ততার জায়গা কোথায়?

তৃতীয়ত, কর্মক্ষম এবং অবসরপ্রাপ্ত মিলিয়ে প্রায় যে হাজার চারেক শ্রমিক এখন আছেন, তাঁদের মধ্যে বড়জোর এক-দেড়শোজনের প্রোমোটার পাসারির মিল চালানায় আপত্তি না-ও থাকতে পারে। বাদবাকি শ্রমিক প্রোমোটার পাসারিকে দিয়ে কানোরিয়া জুটমিল ঠিকমত চলতে পারে— একথা বিশ্বাসই করেন না। যে কেউ কানোরিয়ায় এসে শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে কথাটার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। অতএব, বেশিরভাগ শ্রমিক চেয়েছিল মিল যেভাবে হোক খুলে যাক অর্থাৎ পাসারিই মিল খুলুক— একথা সবৈব মিথ্যাই শুধু নয়, প্রোমোটার পাসারিকে দিয়ে মিল খোলানোর শ্রমমন্ত্রীর জবরদস্তিকে সমর্থন জানানোর ধূর্ত চেষ্টাও বটে। সত্য এটাই যে, কানোরিয়া শ্রমিক প্রোমোটার পাসারিকে আগেও চায়নি, এখনও চাইছে না আর ভবিষ্যতেও চাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শ্রী দেবনাথের আর এক বড় মিথ্যা

আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রী দেবনাথ আরও যেসব মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, তার মধ্যে বড় এক মিথ্যা হলো, কানোরিয়া আন্দোলনকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফসল বলা। সত্য এই যে, একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট বস্তুগত উপাদান কানোরিয়া শ্রমিকদের মধ্যে ছিল, তাঁরা সেভাবে নড়াচড়াও শুরু করেছিলেন। ঘটনাচক্রে নিতান্ত আকস্মিকভাবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হওয়ায় আন্দুল-মৌড়ি অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনে অনভিজ্ঞ কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেবার চেষ্টা আমি করেছিলাম। বলা যেতে পারে, আকস্মিক এক যোগাযোগের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কানোরিয়ার মাটিতে পা দিয়েছিলাম নতুন করে শ্রমিক তথা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশের সঠিক পথের খোঁজে। ক্লান্তিহীন সেই পথের খোঁজ জারি আছে আজও। বলাবাহুল্য, পূর্ব-নির্ধারিত কোন কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিকল্পনামাফিক এই শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। বরং প্রাপ্ত প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধাপে ধাপে কানোরিয়া আন্দোলনকে সংগঠিত করা গিয়েছিল।

তথ্য আরও বলে যে, কানোরিয়া আন্দোলন সংগঠিত করার কালপর্বে কুশল দেবনাথ বা পূর্ণেন্দু বসু কানোরিয়া শ্রমিকদের ধারেকাছেই ছিলেন না। তাঁরা এসেছিলেন, আরও অনেকের মত, শ্রমিকদের আন্দোলন ফেটে পড়ার পর। আসার পরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালন করলেও যাকে নেতৃত্ব দেওয়া বলে, প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনে নবাগত এই দুজনের পক্ষে সেই কাজ করার কোন বাস্তব ভিত্তিই সেদিন ছিল না।

একথা খুব ভালোভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও শ্রী দেবনাথ কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্ব, ঐক্যবদ্ধ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা— এসব কথা বলতে গেলেন কেন? আসলে যে কমিউনিস্ট বিপ্লবী সংগঠন থেকে পূর্ণেন্দু বসু ও কুশল দেবনাথ এসেছিলেন, সে সংগঠনের নেতৃত্বে এঁরা দুজন ছিলেন বটে, তবে প্রফুল্ল চক্রবর্তী তখন সে সংগঠনের 'বসে-যাওয়া' একজন সদস্য বৈ তো নয়, অর্থাৎ আর যাই হোক, সেই সময়ের 'কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্ব' আমি নই। অতএব বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্বের পরিকল্পনায় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে বলে চাউর করতে পারলে পূর্ণেন্দু বসু আর কুশল দেবনাথের কানোরিয়া আন্দোলনে নেতৃত্বের ভাগীদারি প্রতিষ্ঠা করতে অসুবিধা হয়। এই আর কি!

এবার কানোরিয়ার সমবায় আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক অনুশীলন সম্বন্ধে শ্রী দেবনাথ যে লাগামছাড়া কুৎসা করেছেন, সেই প্রসঙ্গে একে একে যাবো।

কানোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ সমবায় আন্দোলন

একথা সত্য যে, এক আধজন শ্রমিকের মধ্যে আধো-আধোভাবে থাকলেও প্রকৃত অর্থে কানোরিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে সমবায়ের ভাবনা ছিল না। সাধারণভাবে জুটশিল্পের, আর বিশেষভাবে কানোরিয়া জুটমিলের পরিস্থিতিতে সমবায় একটা সময় শ্রমিকদের লড়াইয়ের একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠবে, আন্দোলনের গতিধারায় এই সূত্র অনুধাবন করে আমি সমবায়কে একটি নির্দিষ্ট বিকল্প কর্মসূচি হিসাবে শ্রমিকদের সামনে হাজির করি। শ্রমিকদের আন্দোলন তখন তুঙ্গে, ময়দানে তখন টগবগে শ্রমিক, নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আস্থা অগাধ— সব মিলে খানিকটা না বুঝেই হৈ-হৈ করে তাঁরা সমবায় উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তী মালিকপক্ষের উপর্যুপরি হামলার ফলে শ্রমিকরা যখন কোণঠাসা তখন— সমবায়-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তিশালী কুৎসা ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সাময়িকভাবে সমবায়-উদ্যোগ সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান

হয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে, তার পরেও যখনই শ্রমিকরা কোনভাবে লড়াইয়ের কথা ভেবেছেন, লড়াইয়েব চেষ্টা করেছেন, তখনই সমবায়ও তাঁদের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে, তাঁরা সমবায়কে হাতিয়ার করেই এগোতে চেয়েছেন।

তবে এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো যে, সমবায়-কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের কাজ কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে নিজে থেকে করে ওঠা সম্ভব নয়। যেমন, পুঁজির যোগান, কারিগরি-আর্থিক ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের জমায়েত করা, উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি।

আমার কাছেও বিষয়টা এরকম ছিল যে, সমবায়ের পথে এগোতে গেলে আইনকানুনসহ প্রচলিত সমবায়ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো, সরকারকে চাপ দেওয়া, সামাজিক ক্ষেত্র এমনকি সম্ভাব্য বেসরকারি ক্ষেত্র থেকেও রসদ সংগ্রহ করা সবকিছুই রীতিনীতিসম্মতভাবে করার চেষ্টা করতে হবে। এরকমটাই আগে হয়েছে, এখন হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। এক কথায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক ধারা যতদূর আয়ত্ত করা গেছে, কানোরিয়ার শ্রমিকদের সমবায় আন্দোলনও সেইভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছে।

আর একটা জরুরি কথা। কানোরিয়া আন্দোলন কখনও কারও সঙ্গে কোনরকম অর্থনৈতিক আপস করেনি, আবার সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় রসদ-সংগ্রহে অনাবশ্যক দ্বিধাও দেখায়নি।...

তবে, ঘটনা এই যে, শিল্পরক্ষা তথা নিজেদের রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে শিল্প শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে কানোরিয়ার শ্রমিকদের মিল বাঁচানোর লড়াই আজ পর্যন্ত জারি আছে।

প্রসঙ্গ : আন্দোলনে গণতন্ত্রের অনুশীলন

আমাকে স্বেচ্ছাচারী, অগণতান্ত্রিক, সন্দেহপ্রবণ, প্রতি-হিংসাপরায়ণ, আত্মসর্বস্ব, কানোরিয়া আন্দোলনের ক্ষতিসাধন-কারী ইত্যাদি বলে শ্রী দেবনাথ বেমক্কা যতই গাল পাড়ুন না কেন, সত্য এই যে, শুরু থেকে এযাবৎ কানোরিয়া আন্দোলনে গণতন্ত্রের অনুশীলনের চমৎকার এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

বস্তুত, ১৯৯২ সালের শেষদিক থেকে হাজারো দমন-পীড়ন মোকাবিলা করে কানোরিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলন যে আজও টিকে আছে, তার প্রথম এবং প্রধান কারণই হল কর্তাভজা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চালু ধারা থেকে বেরিয়ে এসে এই গোটা পর্যায় জুড়ে কানোরিয়া আন্দোলনে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ধারাবাহিক অনুশীলন। খোলাখুলি ও স্বচ্ছন্দ আলাপ-আলোচনা-মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ শ্রমিকের মতের ওপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কানোরিয়া আন্দোলনে বরাবরই নিষ্ঠাভরে অনুশীলন করা হয়। তবে, মূলত স্বৈরতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থার মধ্যে আজীবন থাকতে বাধ্য হওয়ায় প্রায় অগোচরেই তার বিচিত্র প্রভাব আমাদের কাজকর্মে, আচার-আচরণে, চিন্তাভাবনায় থেকে যায়। শ্রমিকদের পক্ষেও নেতা-নির্ভরতার সুপ্রাচীন নিগড় ভেঙে পুরোপুরি বেরোনো আজও সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেন যে, যত যা হোক, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক করেন শ্রমিকরা নন, নেতারা। তবে যে যাই বলুন, একথাও ঠিক যে, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের ভেতরকার মৌলিক আকাঙ্ক্ষাই হলো গণতন্ত্রের জন্য। এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক বোধ জাগ্রত করার আর গণতান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। কানোরিয়াতেও একইভাবে গণতন্ত্রের প্রাথমিক কিছু অনুশীলনের ওপর আমরা বরাবর জোর দিয়ে এসেছি। যথাসম্ভব বেশি সংখ্যার শ্রমিকদের মিটিং-এ আসতে উৎসাহ দেওয়া; ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি মত জানার চেষ্টা করা, মতবিনিময়, অনেক মতের মধ্য থেকে একটি মতে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া—এইসবই কানোরিয়ার নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়।

গণতান্ত্রিক অনুশীলনের পথে অ-শ্রমিক আমরা যাতে কখনও বাধা হয়ে না দাঁড়াই তার জন্যই কানোরিয়া আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা সহযোগীর বা বড়জোর পরামর্শদাতার। আমাদের পরামর্শ বা সহযোগিতা শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের কোনো পদে সেই কারণে আমরা কোনোকালেই নেই। অর্থাৎ কানোরিয়া আন্দোলনে আমাদের থাকা-না থাকাও সম্পূর্ণতই নির্ভর করে শ্রমিকদের অনুমোদনের ওপর।...

উপসংহার

...পাশাপাশি, সকলকে জানানোর এই যে, সমস্ত বেইমানি, পলায়ন, পক্ষবদলের যাবতীয় ঝড়ঝাপটার পরেও হাতে গোনা আমরা কজন অ-শ্রমিক সহযোগী কানোরিয়ার শ্রমিকদের প্রশ্রয়েই তাঁদের মধ্যেই অবস্থান নিয়ে আছি এবং এই অবস্থান স্থায়ী করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

অন্যদিকে, একথাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, অপরিসীম শোষণ-দমন-পীড়নের মধ্যেও কানোরিয়ার বেশিরভাগ শ্রমিকই আন্দোলন তাঁদের মধ্যে জিইয়ে রেখেছেন আজও। শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলেই পাসারিচক্রের মিল তুলে দেবার চক্রান্তকে পরাস্ত করে কানোরিয়া জুটমিলটা টিকে গেছে।

আর যতদিন মিলটা আছে, কানোরিয়ার সংগ্রামী শ্রমিকদের লড়াইয়ের ময়দান থেকে হটায় কে!

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

কানোরিয়া : লেখকের জবাব

অনীক পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায় 'কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঐ লেখার বিরুদ্ধে প্রফুল্ল চক্রবর্তী একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁর মতে, "শ্রমিক আন্দোলন বিরোধী জঘন্য মিথ্যা কুৎসামূলক এমন লেখা অনীকের পাতায় এর আগে কখনও দেখিনি"। প্রবন্ধটি কেন মিথ্যা কুৎসায় ভরা একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি আমার লেখার একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা হলো, "এই মুহূর্তে কোন্ ইউনিয়নের দিকে বেশিরভাগ শ্রমিক আছে তা বলা অর্থহীন..."। উনি লিখেছেন, এই লেখার মাধ্যমে পাশারি ও বর্তমান শ্রমমন্ত্রীর অগণতান্ত্রিক কাজকর্মকে প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে আমি লেখার পুরো অংশটাই উদ্ধৃ করছি। "লড়াইয়ের উপযুক্ত আধার এই মুহূর্তে কানোরিয়া শ্রমিকদের সামনে না থাকার জন্য পাশারি যখন রাজ্য সরকারের মদতে কার্যত কোন চুক্তি ছাড়াই মিল খুললো, শ্রমিকরা তা মেনে নিতে বাধ্য হলো। একথা আজ জানা প্রয়োজন কানোরিয়া জুটের ৭৫ শতাংশ শ্রমিকই লড়াই থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ১৯৯৩-৯৩ সালে ৯০ শতাংশ শ্রমিক লড়াই চেয়েছিল। তাই লড়াই হয়েছে। আজ ৭৫ শতাংশ শ্রমিক নিষ্ক্রিয় তাই লড়াই নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে কোন ইউনিয়নের দিকে বেশি শ্রমিক আছে তা বলা অর্থহীন, কারণ বেশিরভাগ শ্রমিকই সংগঠিত লড়াইয়ের অবস্থানে নেই। হয়ত কোন একটা ঘটনায় শ্রমিকরা ফুঁসে উঠতে পারেন, বড়ো বিক্ষোভও হতে পারে (যা এখনকার জুট শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য), কিন্তু সংগঠিত ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলন (যা এর আগে কানোরিয়া শ্রমিকরা গড়ে আলোড়ন ফেলেছে) এই মুহূর্তে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই।" আমি গত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের আগের অবস্থায় কানোরিয়া শ্রমিকদের গতি প্রকৃতি যেভাবে বুঝেছি, তাই লিখেছি। প্রফুল্লবাবুর অন্য মত থাকতে পারে। অসুবিধা নেই। কিন্তু বোঝা মুশকিল, এই বক্তব্যতে পাশারির হাত কীভাবে শক্ত হলো, আর কুৎসাই বা কী করে হলো?

প্রসঙ্গত, 'শ্রী দেবনাথের তিন মিথ্যা' শীর্ষক সাবহেডিং-এ উনি বলেছেন যে, কানোরিয়া শ্রমিকদের উপর প্রমোটর, সরকার, রাজনৈতিক দল, গুন্ডা বদমায়েশদের আক্রমণের কথা আমি বলিনি। আমার লেখার বিভিন্ন জায়গাতে ওই বক্তব্য আছে। কিন্তু ওটা আমার মূল বক্তব্য নয়। আমার মূল বক্তব্য হলো, যখন থেকে কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছে তখন থেকেই আক্রমণ নেমেছে। ১৯৯৩ সালের মে মাসে সেখ বরজাহানের উপর আক্রমণ থেকে ৯৪-৯৫-৯৬ বা পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ নেমেছে। ঐ সময় কানোরিয়া শ্রমিক প্রতিরোধী লড়াই গড়তে পেরেছিলেন কারণ তার ছিল লড়াইয়ের শক্তিশালী আধার, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব। আজ আক্রমণের সঠিক মোকাবিলা সে করতে পারছে না, কারণ সেই শক্তিশালী আধার ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব অনুপস্থিত। উনি লিখেছেন, "আজো কানোরিয়া শ্রমিক মিল বাঁচিয়ে নিজেদের বাঁচানোর যে অনবদ্য লড়াই চালাচ্ছেন, প্রোমোটার পাসারিকে হটিয়ে দিয়ে শিল্প শ্রমিক সমবায়ের মাধমে মিল চালানার যে অভূতপূর্ব লড়াই জারি রেখেছেন, তার সবটাই সংগঠিত লড়াই।" জানিনা এই অভূতপূর্ব লড়াই কীভাবে জারি আছে। তবে এটুকু বলতে পারি, *শ্রমিক সমবায়ের বিষয়টি আন্দোলন থেকে বিযুক্ত করে ভুলভাবে শ্রমিক আন্দোলনে রাখার জন্য আজ কানোরিয়া জুটে শ্রমিক সমবায়ের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস করে কানোরিয়া জুটের শ্রমিকরা।* এই বিষয়ে আমার কোন দ্বিধা বা সংশয় নেই।

আমি কোথাও বলিনি, প্রমোটার পাশারিকে শ্রমিকরা মনে প্রাণে চেয়েছিল। পাশারির প্রতি তীব্র ঘৃণা আজো বর্তমান। আমি লিখেছি, চুক্তি মানতে শ্রমিকরা বাধ্য হয়েছে। মনের গভীরে তীব্র ঘৃণা থাকা আর বাস্তবতার জায়গা থেকে বাধ্য হওয়া দুটো কি এক জিনিস? শ্রমিক আন্দোলনে তো জোয়ার ভাটা থাকে। কানোরিয়াতে ভাটার পর্যায় সব সময় থাকবে নাকি? না, থাকবে না। তা আমি আমার প্রবন্ধেই লিখেছি। "কানোরিয়া শ্রমিকদের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কোন কোন সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তারা লড়তে পারবেনা। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা যাচ্ছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তারা লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছেন। এখনও সেই উপাদান আছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং আজকের নিষ্ক্রিয় অবস্থা আগামী দিনে সক্রিয়তায় রূপান্তরিত হতে পারে।" আমার লেখায় আক্রান্ত শ্রমিকের বেদম হয়ে পড়াটাই আমি বড়ো করে তুলেছি বলে প্রফুল্লবাবু যে অভিযোগ করেছেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন।

'শ্রীদেবনাথের আর এক বড় মিথ্যা' সাবহেডিং-এ সমালোচনা করে প্রফুল্লবাবু বলেছেন যে, "কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতৃত্বের পরিকল্পনায় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে বলে চাউর করতে পারলে পূর্ণেন্দু বসু আর কুশল দেবনাথের কানোরিয়া আন্দোলনে নেতৃত্বের ভাগীদারি প্রতিষ্ঠা করতে অসুবিধা হয়। এই আর কি!" আমি কি আমার লেখায় কোথাও দাবি করেছি, আমি নেতৃত্ব দিয়েছি? তাই এই বক্তব্যের কোন অর্থ আছে কি? উনি আরো লিখেছেন, আব্দুল মৌড়ীর কয়েকজন অনভিজ্ঞ তরুণ তরুণীকে নিয়ে উনি (মানে ওনার ভাষায় 'আমি') কানোরিয়া জুটের শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ

দিয়েছিলেন। আমি লিখেছি, 'মতপ্রকাশ' পত্রিকার তরফ থেকে পত্রিকার কর্মীরা কানোরিয়া শ্রমিকদের কাছে গিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে 'মতপ্রকাশ' নতুনভাবে বেরোনোর পর প্রফুল্লবাবু কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে কয়েক পর্বে ধারাবাহিক লেখা লিখেছিলেন। এখন তা আমার টেবিলে। তাতে উনিও লিখেছিলেন, 'মতপ্রকাশ' পত্রিকার তরফে কানোরিয়া শ্রমিকদের কাছে যাওয়া হয়েছিল। এখন মতটা পাল্টালো কীভাবে? 'মতপ্রকাশ' একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন পত্রিকা ছিল। যার সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন পূর্ণেন্দু বসু, কুশল দেবনাথ, অমৃত পৈড়া প্রমুখ। কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক কর্মীর ঝাঁপিয়ে পড়া, শ্রমিক আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করা, কমিউনিস্ট আদর্শ ছাড়া হয় নাকি? কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠা ও ফেটে পড়ার পেছনে যেমন শ্রমিকরা ছিলেন, আবার কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতা ও কর্মীরা ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত প্রয়াস ছাড়া এটা হতো নাকি? এই কথা লিখলে মিথ্যা কুৎসা কীভাবে হয়? আমি বা পূর্ণেন্দু বসু কখন আন্দোলনে গিয়েছিলাম, কতটা অনভিজ্ঞ ছিলাম এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা সবাই মিলে ঐ সাড়া জাগানো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রফুল্লবাবু লিখেছেন উনি (ওনার ভাষায় 'আমি') কানোরিয়া আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ওনার অভিধানে আমরা শব্দটাই নেই। যার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আমার প্রবন্ধে লিখেছিলাম। যা কানোরিয়া জুটের শ্রমিক আন্দোলনে সংকট ও সমস্যা তৈরির অন্যতম কারণ ছিল।

সবশেষে বলা প্রয়োজন, ১৮ বছর পর কোন আন্দোলনকে যখন বিশ্লেষণ করবো তখন তা করতে হবে নির্মোহ দৃষ্টিকোণে। কেন এই অবস্থা? তার জন্য শুধু মালিকি বা রাষ্ট্রীয় বা দলীয় সন্ত্রাসকে দায়ী করলে চলবে না। দেখতে হবে আমাদের মধ্যেকার ভুলকেও। তবেই সত্যে পৌঁছোনো যাবে। সেই দৃষ্টিকোণেই প্রবন্ধটি লিখেছি। আমার বিপরীত মত কারোর থাকতে পারে। অসুবিধা নেই। অন্য মতও আসুক। কিন্তু সমালোচনাকে মিথ্যা, কুৎসা বলে কি সত্যকে আড়াল করা যাবে?। প্রফুল্লবাবু লিখেছেন, উনি একটা বড় লেখা লিখেছেন, *অনীক* ছাপেনি, ওনারা ছাপিয়ে বিলি করবেন। স্বাগত। *অনীক* পত্রিকা এই বিতর্কের জায়গা নয়। ওনারা ছাপান। আমরাও আমাদের বক্তব্য লিখব। বিতর্ক হোক। গোটা সমাজে সত্যকে খোঁজার জন্য এই বিতর্ক অত্যন্ত জরুরি।

কুশল দেবনাথ

আমার দিকে তাকাবে না?

নাহিদা

অনুবাদ: তড়িৎ চৌধুরী

আমি ভালোবাসা নিয়ে কবিতা লিখতে ভালোবাসি
রামধনু আর প্রজাপতির ছবি আঁকি
লাল গোলাপের কুঁড়ির গন্ধ শুঁকি
আর নাচি—
নাচি হাসিখুশি নীল পাখির গানের সাথে তাল মিলিয়ে

আমি চোখ বুজেই দেখতে চাই
শিশুরা হাসছে খিলখিল করে
কোনো বন্দুক আর তাক্ করে নেই যাদের মাথার দিকে—
তাদের আমি শোনাতে চাই
দূর দেশের সেই লিলিফুলের মতো ধব্‌ধবে সাদা পরীদের গল্প
বুলেট যেখানে হিংস্র শব্দে ছুটছে না
আর শোনা যাচ্ছে না মিসাইলের গর্জন . . .

কিন্তু কী করে করবো সেসব?
কী করে করবো?
কী করে?
আমার হৃৎপিণ্ডে বিঁধে রয়েছে একটা কাঁটা
যন্ত্রণায় ছটফট করছি
ব্যথা পাচ্ছি আমি রক্ত ঝরছে
আমি কুঁকড়ে থাকছি
কাঁদছি

মানবতা, কোথায় তুমি?

আমাকে খুন করা হচ্ছে
তোমাদেরই চোখের সামনে
আমি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি . . . কী ভীষণ ঠাণ্ডা. . .
আমি মরে যাচ্ছি
কাঁদছি

কোথায় তুমি, মানবতা?
মুখ ফিরিয়ে থাকছো কেন তুমি?
কেন তাকিয়ে রয়েছো অন্য দিকে?
আমি এখানে
দীর্ঘশ্বাস ফেলছি মরে যাচ্ছি
মরেই চলেছি গাজা'র অলিতে-গলিতে

কোথায়? কোথায় তুমি, মানবতা?
এখনও কি তাকিয়েই থাকবে?
চোখ বুজে? কান বন্ধ করে?
আমি
আমি যখন মরে যাচ্ছি
মরে যাচ্ছে আমার সন্তানরা?

❑ নাহিদা গত ৪২ বছর ধরে তাঁর স্বদেশভূমি জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত একজন প্যালেস্টাইনি শিক্ষিকা ও গণিতজ্ঞ। গত ১৪ নভেম্বর থেকে প্যালেস্টাইনের গাজাতে সাম্রাজ্যবাদের ধারাবাহিক মদতপুষ্ট ইজরায়েলের আগ্রাসী সর্বাত্মক বর্বর আক্রমণের ফলে সেখানে নিহতদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বাদ পড়ছে না শিশুরাও, তবু সভ্য 'গণতান্ত্রিক' দেশগুলির কোনো প্রতিবাদ নেই, চেষ্টা নেই সেই আগ্রাসন বন্ধ করার। এই প্রেক্ষিতেই কবিতাটি রচিত।